Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Bechelor in Dawah & Islamic Studies

Research topic

آخر أسماء وتعاليم أعداء الإسلام على مر العصور

Supervised by

Mawlana Ali Hasan

Department of Research

Islamic online madrasah, IOM

Submitted by

Bushra Zabin Safa

Roll: 216020550

Date: 02 June, 2024

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে ইসলামের দুশমনের শেষ পরিনাম ও শিক্ষা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বুসরা জাবিন সাফা

রোলঃ ২১৬০২০৫৫০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যুগে যুগে ইসলামের দুশমনের শেষ পরিনাম ও শিক্ষা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বুসরা জাবিন সাফা, আইডিঃ ২১৬০২০৫৫০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে ইসলামের দুশমনের শেষ পরিনাম ও শিক্ষা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Bushra Zabin Safa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

বুসরা জাবিন সাফা

আইডিঃ ২১৬০২০৫৫০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা......6

ইসলামের যুগ এর পরিচিতি: 7

১. ইসলাম- পূর্ব আরব......8

২. মুহাম্মাদের জন্ম এবং ইসলামের প্রবর্তন (৫৭০-৬৩২)......10

২.১. বেলাল রা এর পরীক্ষা......13

২.২. বদর যুদ্ধের দুশমনদের পরিনাম 15

২.৩. উহুদ যুদ্ধে দুশমনদের পরিনাম......18

২.৪. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম......24

২.৪.১. আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন এবং পরিণতি:......26

২.৪.২. আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি:......30

২.৪.৩. খালাফের পুত্রদ্বয়ের কটূক্তি ও নিপীড়ন: 35

২.৫. মহানবী সা.-কে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল তায়েফবাসী......39

২.৬. কুরআন তেলাওয়াত শুনতে বাধা প্রদান......42

৩. ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬৩২–৭৫০)......44

৩.১.১. হজরত নুহের (আ.) মহাপ্লাবনের ঘটনা......45

৩.১.২ যেভাবে খোদাদ্রোহী নমরুদের পতন হয়......48

৩.১.৩ নমরুদের ভয়ংকর মৃত্যু 52

৩.২ হাবিল-কাবিল থেকে শিক্ষা 53

৪. ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭৫০-১২৫৮) 54

৪.১ ফেরাউনের শেষ পরিণতি ও আমাদের শিক্ষা......55

৪.২. ক্ষমতার দাপটে ঔদ্ধত্যে বিভোর ফিরাউন: 59

৪.৩. ঈমানদারের উপদেশ ও সতর্কবাণী:......59

৪.৪. ঔদ্ধত্যের কারণে ফিরাউন ও কওমের পরিণতি:......60

৫. প্রাক-আধুনিক যুগ (১২৫৮-১৮শ শতক)....61
৫.১ হযরত শাহজালাল (রঃ):....62
৭. সমসাময়িক যুগ (২০শতক-বর্তমান)....66
৭.১ ইসরায়েল গোটা দুনিয়ার দুশমন....67
৭.২ ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়ঃ....67
৭.২.১ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কিত তথ্য:....68
৭.২.২ ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ:....69
৭.২.৩ যে ভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে:....70
৭.৩ দাজ্জাল:....70
৭.৩.১ দাজ্জালের আগমনের আভাসঃ....72
৭.৩.২ দাজ্জালের শেষ পরিণতিঃ....73
৮. দুশমনদের পরিনতি থেকে আমাদের শিক্ষা....74
৯. মুসলিমের সবচেয়ে বড় দুশমন:....75
শয়তান এবং ইবলিশের মধ্যে পার্থক্য:....77
উপসংহার....82
Referance....84

ভূমিকা

ইসলাম (আরবি: الإسْلَامُ) একটি একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস যার মূল শিক্ষা হলো এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম যার অনুসারী এবং স্বীকৃতিদানকারীর সংখ্যা প্রায় ২০০কোটি যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৪% ।ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং স্বীকৃতিদানকারীরা মুসলিম এবং মুসলমান নামে পরিচিত।মুসলমানরা বিশ্বের ৫০ এর অধিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি গঠন করেছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো আল্লাহ দয়ালু, করুনাময়, এক ও অদ্বিতীয় এবং একমাত্র ইবাদতযোগ্য প্রভু।

মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে-যুগে অনেক নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব এবং নিদর্শন পাঠিয়েছেন।ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো পবিত্র আল-কুরআন, যা স্বয়ং আল্লাহর বাণী; আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ বলা হয় যা হাদিস নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইসলামী ধর্মগ্রন্থানুযায়ী, এটি আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। ইসলাম শুধুমাত্র মক্কা-মদিনা বা আরব দেশ ও জাতির জন্য নয় বরং ইসলাম বিশ্বের সকল বর্ণ, গোত্র, জাতি এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো ও আরব-অনারব সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত ও একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী, যুগে যুগে আদম, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা সহ সকল রাসূলগণের উপর যেসব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, মূল আরবি ভাষার কুরআন হলো তারই সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ, অপরিবর্তিত ও চূড়ান্ত সংস্করণ।

ইতিহাসগতভাবে এর উৎপত্তি ধরা হয় ৭ম শতকের শুরুর দিকে মক্কায় নবী মুহাম্মাদের নবুয়াতের পরবর্তী সময় থেকে। ৮ম শতক নাগাদ উমাইয়া খিলাফত পশ্চিমে ইবেরিয়া (স্পেন) থেকে পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে সম্প্রসারিত হয়। ৮ম থেকে ১৩ শতককে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামি স্বর্ণযুগ বলা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে মুসলিম বিশ্ব বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতির শীর্ষে ছিল। [৩২][৩৩][৩৪] ইসলামের প্রসার ঘটেছে মূলত ধর্মপ্রচার এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে।

ধর্মপ্রচারকালে নানান ভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়া প্রমুখদের। ইসলাম দুশমনদের সাথে করতে হয়েছে জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা সেই অধ্যাবসায় এর বিনিময়ে দেখিয়েছে যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের পরিনতি।

ইসলামের যুগ এর পরিচিতি:

১) ইসলাম-পূর্ব আরব

২) মুহাম্মাদের জন্ম এবং ইসলামের প্রবর্তন (৫৭০-৬৩২)

৩) ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬৩২–৭৫০)

৪) ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭৫০-১২৫৮)

৫) প্রাক-আধুনিক যুগ (১২৫৮-১৮শ শতক)

৬) আধুনিক যুগ (১৮শ-২০শতক)

৭) সমসাময়িক যুগ (২০শতক-বর্তমান)

১. ইসলাম- পূর্ব আরব

ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপ ছিল বহুদেববাদী। প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব দেবতা ও দেবীদের বিশ্বাস ও উপাসনা করত। এই দেবতা ও দেবীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামপূর্ব আরবদের বিশ্বাসানুযায়ী, লাত ছিল পাতালের দেবী, উজ্জা ছিল উর্বরতার দেবী এবং মানাত ছিল ভাগ্যের দেবী। এই দেবতা ও দেবীদের আত্মা গাছ, পাথর, জলাশয় এবং কুয়োগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই স্থানগুলোকে পবিত্র বলে মনে করা হত এবং সেখানে প্রায়ই তাদের উপাসনা করা হত। আরব পুরাণে, মূর্তিগুলোকে দেবতা ও দেবীদের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। এই মূর্তিগুলো প্রায়ই পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। মূর্তিগুলোকে পূজা করা হত এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা হত। ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপে উপসনার জন্য অনেকগুলো পবিত্র স্থান ছিল। এই স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে কাবা, যা মক্কায় অবস্থিত একটি পবিত্র ঘনআকৃতির কাঠামো। কাবাকে ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আরবরা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করত। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ এবং সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। পবিত্র স্থানগুলোতে পরিদর্শনকারীরা বিভিন্ন উপাসনা করত, যেমন প্রার্থনা, উপবাস এবং পশু জবাই।

মক্কার কাবা প্রাচীনকালে বিভিন্ন আরব উপজাতিদের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের ১৬০টি মূর্তির আবাসস্থল ছিল। এই মূর্তিগুলো বিভিন্ন আকৃতি ও আকারের ছিল এবং সেগুলোকে বিভিন্ন নিয়মে পূজা করা হতো। কাবায় অবস্থিত তিনটি দেবী, মানাত, লাত এবং উজ্জাকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করা হতো। এই দেবীদেরকেও বিভিন্ন উপায়ে পূজা করা হতো। অন্যদিকে আরব সমাজে খ্রিস্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন একত্ববাদী সম্প্রদায়ও ছিল। এই সম্প্রদায়গুলো একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত এবং মূর্তিপূজা করত না। স্থানীয় আরবদের মধ্যে হানিফরাও ছিল। হানিফরা একত্ববাদী ছিল এবং

তারা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত।তবে তাদেরকে কখনও কখনও ভুল করে খ্রিস্টান বা ইহুদিদের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো।মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদও একজন হানিফ ছিলেন এবং তিনি ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর ছিলেন।

ইসলামী সাহিত্যে, ইসলামের আগের আরব সমাজের যুগকে "আইয়ামে জাহেলিয়া" বা "অজ্ঞতার যুগ" বলা হয়। এই শব্দটি কুরআন ও হাদীসে আরবদের ইসলামের আগের বিশ্বাস ও আচরণকে ইসলামী যুগ থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি, মূর্তিপূজা, অবিচার এবং দাসত্বের স্বাভাবিকতা। আইয়ামে জাহেলিয়ার সময় আরবরা ইসলামি শিক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, তারা প্রায়শই অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস এবং বর্বর আচরণে লিপ্ত ছিল। তারা প্রায়শই ব্যভিচার, চুরি, মূর্তি পূজা, অবিচার এবং দাসত্বে লিপ্ত হত।

ইসলামী ইতিহাসবিদদের মতে, জাহিলী যুগে নারীদের নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখা হত। বহুবিবাহ খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। পতিতাবৃত্তি একটি সাধারণ পেশা ছিল এবং দাস মালিকরা তাদের দাসীদের এই কাজে বাধ্য করত। নারীরা তাদের বাবা বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না। সন্তানরা চাইলে তাদের বাবার মৃত্যুর পরে তাদের সৎমায়ের সাথে বিবাহ করতে পারত। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের ছিল এবং তা ছিল সীমাহীন। অভিজাতরা কন্যা সন্তান হলে তাকে একটি লজ্জার উৎস হিসেবে দেখত এবং তাদের হত্যা করত। এই সময়ে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো জঘন্যতম কাজও করা হত। আরবরা অন্যান্য জাতি থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না শিশু হত্যার ক্ষেত্রে, যা উৎসর্গ বা অন্যান্য কারণে করা হত।

২. মুহাম্মাদের জন্ম এবং ইসলামের প্রবর্তন (৫৭০-৬৩২)

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদ(সাঃ) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের প্রথম দিকেই পিতৃমাতৃহীন হন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং 'আমিন' (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত হন। পরে তিনি তার মনিব, ব্যবসায়ী খাদিজা (রাঃ)কে বিয়ে করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, মক্কায় বিদ্যমান নৈতিক অবক্ষয় ও মূর্তিপূজা দ্বারা বিরক্ত হয়ে এবং নির্জনতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার জন্য, মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কার কাছে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় আশ্রয় নেন। গুহায় থাকাকালীন সময়েই আল্লাহর নিকট হতে ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হয়.।মুহাম্মাদের গুহায় থাকাকালীন অবস্থায় যে রাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তাকে 'লায়লাতুল কদর' (শবে কদর) বলা হয় এবং এই ঘটনাটিকে ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা হয়। ৪০ বছর বয়স থেকে, জীবনের পরবর্তী ২২ বছর ধরে, মুহাম্মাদ(সাঃ)এর নিকট আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তিনি মানবতার কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নবী।

মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রথম তিন বছর ধরে শুধুমাত্র তার পরিবার এবং আত্মীয়দের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এই সময়ে, তিনি তাদেরকে ইসলামের মূল বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন, যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি, এবং ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভ।

মক্কায় থাকাকালীন সময়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রথমে গোপনে ও তারপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং তার শ্রোতাদের বহুঈশ্বরবাদ ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানান। ইসলামের প্রথম দিকের অনেক গ্রহণকারী ছিল নারী, গরীব, বিদেশী এবং দাসেরা যেমন প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবাশি।মক্কার অভিজাতরা মনে করতেন যে এক আল্লাহর প্রচার করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ তাদের

সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলছেন কারণ তারা কাবার মূর্তিগুলোর জন্য তীর্থ করতে আসা তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করতো।মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন আরও বেশি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে শুরু করলেন, তখন মক্কার অনেক গোত্র তার বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা তাকে এবং তার অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে শারীরিক আঘাত, সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সামাজিক বয়কট। মক্কার নির্যাতন থেকে বাঁচতে, মুহাম্মাদ ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে কিছু মুসলিমকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবিসিনিয়া ছিল একটি খ্রিস্টান রাজ্য, কিন্তু তারা মুসলিমদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল।

মুসলিমদের উপর মক্কার অধিবাসীদের ১২ বছরের নির্যাতনের পর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ এবং তার সাহাবীরা ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) শহরে হিজরত (অভিবাসন) করেন। সেখানে, মদিনার গ্রহীতাদের (আনসার) এবং মক্কার প্রবাসীদের (মুহাজির) সঙ্গে মুহাম্মাদ মদিনায় তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মদিনার সকল উপজাতি মদিনার সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদটি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব আইন ব্যবহারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সকল প্রকার বাহ্যিক হুমকি থেকে মদিনাকে রক্ষা করার জন্য সকল গোত্রের মাঝে একটি চুক্তি স্থাপন করে।

৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করার পর, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হননি। তাই, মুহাম্মাদ মুসলিম বাহিনী গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধগুলোতে, মুসলিম বাহিনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করে।

মক্কার বাহিনী ও তাদের মিত্ররা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয় এবং তারপর উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মদিনাকে অবরোধ করতে ব্যর্থ

হয়। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা এবং মুসলিমদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু দুই বছর পর মক্কার অধিবাসীরা এটিকে ভঙ্গ করে। আরও উপজাতি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায়, মক্কার বাণিজ্যপথগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ৬৩০ সালে, মুহাম্মাদ (সাঃ) একটি বড় মুসলিম বাহিনী গঠন করে মক্কায় অভিযান চালায়। এই অভিযানে, মুসলিম বাহিনী মক্কায় বিজয় অর্জন করে এবং কাবা থেকে সকল প্রকার মূর্তি অপসারণ করে। এই বিজয় আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিস্তারকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। ৬৩২ সালে, মুহাম্মাদ (সাঃ) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং আরাফাত পাহাড়ে প্রায় ১২৪,০০০ মুসলিমের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি মুসলিমদেরকে পরস্পরের সাথে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার বন্ধন গড়ার আহ্বান জানান। উক্ত ভাষণের কয়েক মাস পরে, মদিনায় থাকাকালীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর আগে, আরব উপদ্বীপের বৃহৎ অংশের ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে, আরব উপদ্বীপের মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় (৬২ বছর বয়সে) মুহাম্মাদ আরব উপদ্বীপের উপজাতিগুলোকে একটি একক ধর্মীয় রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করেন।

মুহাম্মাদ ছিলেন একজন মহান ধর্মীয় নেতা এবং তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে পৃথিবীর অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২.১. বেলাল রা এর পরীক্ষা

হাবশি ক্রীতদাস হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিযুক্ত প্রথম মুয়াজ্জিন তিনি। আল্লাহর এ বান্দা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের কথা শুনে কাল বিলম্ব না করে ইসলামে প্রবেশ করেন।
হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উমাইয়্যা ইবনে খালফের গোলাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে উমাইয়্যা ইবনে খালফ প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়।

ইসলাম থেকে ফিরে আসার জন্য তাঁর ওপর চলতে সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন। তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। খাদ্য ও পানীয়বিহীন উত্তপ্ত রৌদ্রে পাথর চাঁপা দিয়ে ফেলে রাখা হয় তাঁকে।

বুকের ওপর ভারী পাথর চাপায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় তার। শুধু 'আহাদ আহাদ' অর্থাৎ 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক' ছাড়ার আর কোনো কথাই বেরুচ্ছিল না।
নিষ্ঠুর উমাইয়্যা ইবনে খালফ ও তার বাহিনী যতই তাকে অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে; হজরত বেলালের ঈমানি শক্তি ততই বাড়তে থাকে। তাই প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করেও তিনি শুধুই বলতে থাকতেন আহাদ, আহাদ।

আত্যাচারী মুনিব উমাইয়্যা নির্যাতন করতে করতে হয়রান, পেরেশান; তাঁকে ক্লান্তিতে পেয়ে বসে। হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থায়ও ছিলেন ইসলামের ওপর অটল ও অবিচল। শত নির্যাতনেও তাঁর ঈমানকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি ইসলামের দুশমন উমাইয়্যা।

এক পর্যায়ে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বহু চেষ্টার পর উমাইয়্যা ইবনে খালফের কাছ থেকে হজরত বেলালকে ক্রয় করেন। হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্রয় করার পর তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

স্বাধীন হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ পান।মক্কার কুরাইশরা মদিনায় আক্রমণ এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলে সে যুদ্ধেও হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু অংশ গ্রহণ করেন।

মক্কার জীবনে যে উমাইয়্যা ইবনে খালফ হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিষ্ঠুর নির্যঅতন করেছিলেন। বদর প্রান্তরে তাঁর সঙ্গেই উমাইয়্যা মুখোমুখী হয়।

নির্যাতনকারী উমাইয়্যা ইবনে খালফের শেষ নিষ্পত্তি ঘটে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতেই।

শত নির্যাতনেও হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলাম, মুসলমান ও রিসালাতের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

২.২. বদর যুদ্ধের দুশমনদের পরিনাম

বদর যুদ্ধে আবু জাহেলের করুণ মৃত্যু হয় যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় বদর যুদ্ধ। মক্কায় কাফের-মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতন সয়ে সাহাবিদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু কাফেররা সেই মক্কাতে বসেও মদিনায় মুসলিমদের জীবন অতিষ্ঠ করার সব পায়তারা চালিয়ে গেল। আল্লাহর নির্দেশে কাফেরদের শায়েস্তা করতে হক বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট লড়াই সংঘটিত হয় মদিনার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বদর প্রান্তরে।

এ যুদ্ধে মারা যায় কাফের শক্তির প্রধান সেনাপতি, ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জাহেল। দু’জন কিশোর সহোদর ভাইয়ের হাতে নিহত হয় কাফেরদের প্রতাপশালী নেতা।

এই দুই সহোদর যখন শুনেছেন কাফেরদের সর্দার আবু জাহেল নবীকে মক্কায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে। নির্মম নির্যাতনের পর নবীজি মদিনায় আসার পথেও তাকে শান্তি দেয়নি আবু জাহেলরা। তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো।

নবীকে কষ্ট দেয়ার কথা শুনে তারা শপথ করেছিলেন— আবু জাহেলকে দেখা মাত্রই হত্যা করবেন।

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধে আবু জাহেলও বদর প্রান্তরে এসেছে। তার ইচ্ছা, আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের এবার শেষ করে দেবে। আবু জাহেলের রক্তে হাত রাঙানোর শপথে বলীয়ান দুই সহোদর ভাইও বদর মাঠে এলেন। চোখে আবু জাহেলকে হত্যার নেশা। মনে বহু দিনের পোষে রাখা ক্ষোভ। নাঙা তলোয়ার হাতে দাঁড়ালেন যুদ্ধমাঠে।

যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশ পক্ষের বীর উতবা, ওয়ালিদ হুঙ্কার ছেড়ে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বের আহ্বান জানায়। তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে প্রথম আফরার তিন ছেলে মুয়াজ, মুয়াওয়িজ ও আওফ (রা.) তরবারি হাতে ময়দানের দিকে ধাবিত হন। রাসুল (সা.) তাদের বাধা দেন। হামজা (রা.), আলী (রা.) ও অন্যদের এগিয়ে দেন। প্রাণের নবীর দুশমনকে হত্যার নেশা মুয়াজ ও মুয়াওয়িজ উদ্দীপ্ত করে চলছে। তারা ছুটে চললেন। গিয়ে দাঁড়ালেন এক ব্যক্তির মাঝখানে। টার্গেট আবু জাহেল। কিন্তু আবু জাহেলকে চিনেন না। দুই তরুণের মাঝখানের সেই ব্যক্তির নাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মুখে শোনা যাক দুই ভাইয়ের বীরত্বের কথা— 'আমি বদর যুদ্ধের সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। যুদ্ধ বেঁধে গেছে। আমি আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝে আমি রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা, তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

সে বলল, আমি জানতে পেরেছি, সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে গালমন্দ করেছে। আমি আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করে এসেছি— যার হাতে আমার প্রাণ। আমি তার ওপর আক্রমণ করব এবং আক্রমণ চালিয়েই যাব যতক্ষণ আমাদের মধ্যে কেউ একজন না মরবে। যার মরণ আগে নির্ধারিত সেই মরবে। আমি হই বা সে...।

আমার হৃদয় সাহসে ভরে গেল। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে অনুরূপ বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহেলকে দেখলাম। সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল। এরা হলো, আফরার দুই পুত্র।' (বুখারি: ৩৯৮৮)

মুয়াজের বর্ণনায় আবু জাহেল হত্যার চিত্রপট এভাবে বর্ণিত হয়েছে— 'আমি যখন আবু জাহেলকে চিনে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্দেশ্য করে রওনা করলাম। মুশরিকরা তার নিরাপত্তার জন্য চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। একজন মুসলিম সৈনিক আমাকে লক্ষ করে বললেন, ওহে বালক, আবু জাহেলের কাছে যেও না। তোমার ওপর কঠিন বিপদ নেমে আসবে। আল্লাহর কসম, তার সাবধান বাণী শুনে আমার ভেতরে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তাকে হত্যার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেল।

আমি আবু জাহেলের দিকে এগিয়ে গেলাম। সুযোগ পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ক্ষিপ্র বেগে আঘাত করলাম। প্রচণ্ড গতির আঘাতে তার পায়ের গোছা শরীর থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে থুবড়ে পড়ল। আমার ভাই মুয়াউওয়াজও আমার অনুসরণ করল।

সে আবু জাহেলের ওপর চড়ে বসে তার গলায় ছুরি চালাতে থাকল। মুশরিকরা আবু জাহেলকে বাঁচানোর জন্য তার দিকে তীর, বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল। চতুর্মুখী আক্রমণে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। তিনি শহিদ হয়ে আবু জাহেলের পাশেই পড়ে রইলেন। আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা আমার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত চালাল, আমার বাম হাত কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হলো। কিন্তু হাতটি বাম পাঁজরের চামড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকল।'

যুদ্ধ থেমে গেল। মুশরিকরা পালানোর পথ ধরল। ৭০ মুশরিক বন্দি হলো। ৭০ জন মারা পড়ল। মুসলমানদেরও ১৪ জন শহিদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছে গেল। রাসুল (সা.)-এর কাছে আবু জাহেলের মৃত্যু সংবাদ আসে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। প্রীত হলেন। দুই বালকের শপথে বলীয়ান ও সাহসের গল্প শুনলেন। আল্লাহর রাসুলের প্রতি

ভালোবাসা ও আনুগত্যের আকুণ্ঠ সমর্পণ দেখে তিনি বেজায় খুশি হলেন। তাদের জন্য দোয়া করলেন। কাছে ডাকলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাদের কাজে মুগ্ধ হয়ে বলেন, ‘ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে অবস্থান করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, তা আর কোনো দু’জনের মধ্যে অবস্থান করে পাইনি, রাসুলের কথা আলাদা।’

ইতিহাসের নিকৃষ্ট চরিত্র আবু জাহেলের হত্যাকারী দুই মুসলিম তরুণের মা আফরা বিনতে উবাইদ (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে বিরলতম উদাহরণ। এ মহীয়াসী নারীর সাত সন্তানই বদরযুদ্ধে অশংগ্রহণ করেছিলেন।

২.৩. উহুদ যুদ্ধে দুশমনদের পরিনাম

অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, যাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই ছিলেন আনসার, অর্থাৎ তাঁদের পঁয়ষট্টি জন লোক শহীদ হয়েছিলেন, খাযরাজ গোত্রের একচল্লিশ জন এবং আউস গোত্রের চবিবশ জন। একজন ইহুদী নিহত হয়েছিল এবং মুহাজির শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন।

অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, যাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই ছিলেন আনসার, অর্থাৎ তাঁদের পঁয়ষট্টি জন লোক শহীদ হয়েছিলেন, খাযরাজ গোত্রের একচল্লিশ জন এবং আউস গোত্রের চবিবশ জন। একজন ইহুদী নিহত হয়েছিল এবং মুহাজির শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন।

এখন বাকী থাকল কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কথা। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাইশ জন। কিন্তু আসহাবে মাগাযী এবং আহলুসসিয়ার এ

যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং যাতে যুদ্ধের বিভিন্ন স্থানে নিহত মুশরিকদের যে আলোচনা এসেছে তাতে গভীরভাবে চিন্তা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা বাইশ নয়, বরং সাঁইত্রিশ হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী

মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরে এসে (তৃতীয় হিজরী সনের ৮ই শাওয়াল শনিবার ও রবিবার মর্ধবর্তী) রাত্রে উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। যুদ্ধ তাঁদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। তবুও তাঁরা মদীনার পথে ও গমনাগমন স্থলে সারারাত পাহারা দিতে থাকেন এবং তাঁদের প্রধান সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা, যে কোন দিক থেকেই তাঁর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

বলেছিলেন, 'আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক!' তারপর তাঁরা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন, কোন অনিষ্ট তাঁদেরকে স্পর্শ করে নি, এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তাঁরা তারই অনুসরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল (সূরাহ আল-ইমরান (৩) : ১৭৩-১৭৪)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিবার হামরাউল আসাদে পৌঁছেছিলেন এবং সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৯ই, ১০ই এবং ১১ই শাওয়াল তথায় অবস্থান করেছিলেন, এরপর মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। ফিরবার পূর্বে আবূ উযযা জুমহী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে বন্দী হয়। এ ছিল ঐ ব্যক্তি যে বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর দারিদ্র ও কন্যার আধিক্যের কারণে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি পেয়েছিল। শর্ত ছিল, সে ভবিষ্যতে কখনও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করবে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কবিতার মাধ্যমে নাবী (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সে নিজেও আগমন করে, তাকে গ্রেফতার করে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র খিদমতে হাযির

করা হয় তখন সে বলতে শুরু করে : ‘মুহাম্মাদ (ﷺ) আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমার শিশু সন্তানদের খাতিরে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, এরূপ অপরাধমূলক কাজ আর কখনও করব না।’ নাবী (ﷺ) উত্তরে বলেন,

)لَا تَمْسَحُ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ بَعْدَهَا وَتَقُوْلُ : خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنِ، لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ(

‘এখন এটা হতে পারে না যে, মক্কায় ফিরে গিয়ে নিজের কপালে হাত মেরে বলবে, ‘আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দু’দুবার প্রতারিত করেছি। মু’মিনকে এক ছিদ্র হতে দু’বার দংশন করা হয় না।’ এরপর তিনি যুবাইর (রাঃ)-কে অথবা আ’সিম ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা তাকে হত্যা করেন।

অনুরূপভাবে মক্কার একজন গুপ্তচরও মারা যায়। তার নাম ছিল মুআবিয়া ইবনু মুগীরা ইবনু আবিল আস। সে ছিল আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নানা। উহুদের দিন মুশরিকরা যখন মক্কার দিকে ফিরে যায় তখন সে তার চাচাতো ভাই উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, সে যদি মদীনায় তিন দিনের বেশী অবস্থান করে তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু মদীনা যখন মুসলিম সৈন্য হতে শূন্য হয়ে গেল তখন এ লোকটি কুরাইশের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মদীনায় তিন দিনের বেশী থেকে যায়।

অতঃপর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনায় ফিরে আসে তখন সে পালাবার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহ (রাঃ) ও আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন তারা যেন ঐ ব্যক্তির পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করেন।

হামরাউল আসাদ অভিযানের বর্ণনা পৃথক নামে দেয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা উহুদ যুদ্ধেরই একটা অংশ ও পরিশিষ্ট।

تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْن فَإِنَّهُم يَأْلَمُوْن كَمَا تَأْلَمون وَتَرْجُوْن مِن الله مَا لا يَرْجُوْن (
]النساء[: 104

এ (শত্রু) কওমের পশ্চাদ্ধাবনে দুর্বলতা দেখাবে না, কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। [আন-নিসা (৪) : ১০৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি সাধনে ও ক্ষতি অনুভব করণে এক সেনা বাহিনীকে অন্য সেনা বাহিনীর সাথে উপমা দিয়েছেন। যার মর্মার্থ হল, দুই পক্ষেরই অবস্থান সমপর্যায়ের ছিল। উভয় পক্ষই এমন অবস্থায় ফিরে এসেছে যে, কেউ কারোরই উপর জয়ী হতে পারে নি।

এ যুদ্ধের উপর কুরআনের ব্যাখ্যা (الْقُرْآن يَتَحَدَّث حَوْل مَوْضُوْع الْمَعْرِكَة):
পরবর্তীতে কুরআন নাযিল হলে তাতে এ যুদ্ধের এক একটি মনযিলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিশদ ব্যাখ্যা করে ঐ কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোর ফলে মুসলিমগণকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এ ধরণের ফায়সালাকৃত সময়ে ঈমানদার এবং এ উম্মতকে (যারা অন্যান্য উম্মতের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে) যে সব উঁচু ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে অস্তিত্বে আনা হয়েছে, ওগুলোর দিক দিয়ে এখনও তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কী কী দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে মুনাফিক্বদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তাদের অন্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যে শত্রুতা লুক্কায়িত ছিল তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সরলমনা মুসলিমগণের অন্তরে এ মুনাফিক্বরা এবং তাদের ভাই ইহুদীরা যে কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে রেখেছিল তা দূরীভূত করা হয়েছে। এ প্রশংসনীয় হিকমত এবং উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা এ যুদ্ধের ফল ছিল।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ আল-ইমরানের ষাটটি আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্ব প্রথম যুদ্ধের প্রাথমিক মনযিলের উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে,

)وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَال ( ]آل عمران: 121 [

(স্মরণ কর) যখন তুমি সকাল বেলায় তোমার পরিজন হতে বের হয়ে মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করছিলে। [আলু 'ইমরান (৩) : ১২১]

তারপর শেষে এ যুদ্ধের ফলাফল ও রহস্যের উপর ব্যাপক আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে,

)مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلٰى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيْمٌ(

অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়িবের বিধান জ্ঞাত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন, কাজেই তোমরা

আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন আর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।' [আলু 'ইমরান (৩) : ১৭৯]

এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সক্রিয় উদ্দেশ্য ও রহস্য (الْحُكْمُ وَالْغَايَاتُ الْمَحْمُوْدَةُ فِيْ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ):

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।[1] হাফেয ইবনু হাজার (রঃ) বলেছেন যে, ওলামারা (ইসলামী পন্ডিতগণ) বলেছেন যে, গাযওয়ায়ে উহুদ ও তার মধ্যে মুসলিমগণের পরাজয়ে মহান আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উপকার নিহিত ছিল। যেমন অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত ও বাধা না মানার দুর্বিপাক সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা, কারণ তীরন্দাযগণকে নিজ স্থানে জয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে কেন্দ্র পরিত্যাগ করেছিল যার পরিণতি হিসেবে এ পরাজয়। একটি উদ্দেশ্য রাসূলগণের সুন্নাতের প্রকাশ করা, তাঁদেরকে প্রথমে বিপদে ফেলে শেষে বিজয়ী করা হয়। আর তাতে এ রহস্যও লুক্কায়িত আছে যে, যদি তাঁদেরকে বরাবর বিজয়ী করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে যারা মু'মিন নয়। তখন সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। আর যদি বরাবর পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হতো তাহলে নাবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। কাজেই আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জয় পরাজয় দুটিরই প্রয়োজন আছে যাতে সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। কারণ মুনাফিক্বদের কপটতা মুসলিমগণের নিকট গোপন ছিল। যখন এ ঘটনা সংঘটিত হল তখন মুনাফিক্বগণ কথা ও কর্মে প্রকাশ করে দিল। আর মুসলিমগণ জানতে পারল যে, তাঁদের মধ্যেই নিজেদের শত্রু বর্তমান। কাজেই মুসলিমগণ তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ও সতর্ক হলেন।

একটা উদ্দেশ্য বা রহস্য এটাও ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য আসতে বিলম্ব ঘটলে নম্রতার সৃষ্টি হয় ও আত্ম-অহংকার নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই পরীক্ষায় পড়ে

যখন মুসলিমগণ বিপন্ন হয়ে পড়লেন তখন তাঁরা ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন আর মুনাফিক্বগণ হা-হুতাশ আরম্ভ করে দিল।

একটা উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীগণের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে এমন অনেক মর্যাদা (জান্নাত) তৈরি করেছেন, যেখানে তাঁদের আমল দ্বারা পৌঁছা সম্ভব নয়। কাজেই বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে এমন অনেক উপায় নিহিত রেখেছেন যদ্দ্বারা তাঁরা সেই সব মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন।

আর একটা হিকমত বা রহস্য ছিল, শাহাদত লাভ আওলিয়া কিরামের সর্বাপেক্ষা বড় পদমর্যাদা। কাজেই এ পদমর্যাআ তাঁদের জন্য সরবরাহ করে দেয়া হয়েছিল।

আরও একটি রহস্য নিহিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ কুফরী, অত্যাচার ও আল্লাহর ওলীগণকে কষ্ট দেওয়াতে সীমাতিরিক্ত অবাধ্যতা (করার পরিণতিতে) ঈমানদারগণকে গোনাহ হতে পাক ও পরিচ্ছন্ন করলেন ও বিধর্মী কাফিরগণকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করলেন।

২.৪. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কাফেরদের নির্যাতন: রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কাফিরদের নির্যাতন ছিল দু'ধরনের।

১. মানসিক

২. দৈহিক।

মানসিক নির্যাতন: কাফিররা পরিকল্পিতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নানা অপবাদ আরোপ করে মানসিকভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তাদের আরোপিত অপবাদসমূহ যেমন- (১) পাগল (তূর ৫২/২৯), (২) কবি (ছাফফাত ৩৭/৩৫-৩৬), (৩) জাদুকর ও (৪) মিথ্যাবাদী (ছোয়াদ ৩৮/৪), (৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী (আনফাল ৮/৩১; ফুরক্বান-২৫/৫), (৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী (ফুরক্বান-২৫/৪), (৭) মিথ্যা রটনাকারী (নাহল-১৬/১০১; ফুরক্বান-২৫/৪), (৮) ভবিষ্যদ্বক্তা (তূর ৫২/২৯), (৯) পথভ্রষ্ট (তাত্বফীফ ৮৩/৩২), (১০) বেদ্বীন[3], (১১) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী ও (১২) জামা'আত বিভক্তকারী[4], (১৩) জাদুগ্রস্ত (বনী ইসরাঈল ১৭/৪৭), (১৪) মুযাম্মাম (নিন্দিত)।[5] কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিয়ে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলত।[6] (১৫) 'রা'ইনা' (বাক্বারা ২/১০৪) প্রভৃতি।

এসব নির্যাতনের পরিণতিতে এরা দুনিয়াতে হেদায়াত বঞ্চিত হয় এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন, انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ, ওরা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা পথ পেতে পারে না' (বনু ইসরাঈল ১৭/৪৮)।

দৈহিক নির্যাতন : উপরোক্ত মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি এরা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শারীরিক নির্যাতনও করত। নিম্নে কয়েকজনের নির্যাতন ও তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হ'ল।–

২.৪.১. আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন এবং পরিণতি:

রাসূল (ছাঃ) কম-বেশী সকল কাফির- মুশরিক নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন। তন্মধ্যে আবু লাহাব অন্যতম। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। সে লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' অর্থাৎ 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা' বলা হ'ত। এছাড়া 'আব্দুল ওযযা' নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় পবিত্র কুরআনে তার আসল নাম বর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। তার পরেও সে নবী করীম (ছাঃ)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ নানা রকম নির্যাতন করত।

একদা নবী করীম (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আহবান জানালেন, হে বনু ফিহর! হে বনু আদী! এভাবে কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রকে। এতে সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হ'ল। যে পারেনি সে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল কি ব্যাপার জানার জন্য। কুরায়েশরা এসে হাযির হ'ল, আবু লাহাবও তাদের সাথে ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে শত্রুসৈন্য অবস্থান করছে। ওরা যেকোন সময় তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তুত, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব। কারণ আপনাকে আমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। একথা বলার জন্য তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। যাতে বলা হয়, 'আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও'।[7]

অন্যত্র আছে, সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-কে মারার জন্য আবু লাহাব একটি পাথরও তুলেছিল।[8] তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুওয়াত পূর্বকালে রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে সে তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে এই দুই মেয়ের সাথেই একের পর এক ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[9]

রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (উপনাম ত্বাইয়েব বা তাহের) মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ (الأبتر) হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়।

হজ্জের মৌসুমে আবু লাহাব রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোকদেরকে ভাগিয়ে দিত এবং বলত, إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ ‘এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না’।[10] এমনকি ‘যুল মাজায’ নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহ’লে সফলকাম হবে’, তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলের পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[11] এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সে একের পর এক নির্যাতন অব্যাহত রাখে।

অবশেষে আবূ লাহাবের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবী গযব নেমে আসে। আবু লাহাবের মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও জঘন্যভাবে হয়। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় ফেলে আসে। সেখানে ধুকে ধুকে তার মৃত্যু হয়। তার লাশটি পর্যন্ত কেউ

স্পর্শ করেনি। শেষ পর্যন্ত দেহ পঁচতে শুরু করলে গর্ত খুঁড়ে চাকর দ্বারা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে সে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়।[12]

আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া (أروى) অথবা ‘আওরা’ (العوراء) ওরফে উম্মে জামীল অর্থাৎ সুন্দরের উৎস। সেও স্বামীর একান্ত সহযোগী ছিল এবং সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকত। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় حمالة الحطب বা খড়িবাহক বলা হ’ত। অর্থাৎ ঐ শুষ্ক কাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন বিস্তার করে। আবু লাহাবের স্ত্রী একাজটিই করত আড়ালে থেকে। সেকারণ আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। আবু লাহবের স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পান। এই মহিলা ছিল একজন কবি। সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলত। সূরা লাহাব নাযিল হ’লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খন্ড নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা‘বা চত্বরে গমন করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (ছাঃ) সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি। তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসা মূলক কবিতা বলে ফিরে আসে। উক্ত কবিতায় সে ‘মুহাম্মাদ’ (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে ‘মুযাম্মাম’ (নিন্দিত) বলে। যেমন مُذَمَّمًا عَصَيْنَا- وَأَمْرَه ُ قَلَيْنَا وَدِيْنَه ُ أَبَيْنَا- ‘নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি। তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি। তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি’।[13] আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? জবাবে তিনি বললেন, না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ আমার জন্য তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[14]

রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন তখন বকরীর নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারত যে, সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়ত। আবার কখনও কখনও উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হ'লে সে হাঁড়িতে নিক্ষেপ করত। রাসূল (ছাঃ) তাদের অত্যাচারে ঘরের ভিতরে নিরাপদে ছালাত আদায় করার জন্য একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন।[15]

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলায় একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেন এবং হালাক করে দেয়' (কুরতুবী)।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী হয়ে বলল, আমি وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى 'নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি (নাজম ৫৩/১-২) এই আয়াত দু'টিকে অস্বীকার করি বলে একটা হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল এবং থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো'আ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 'আল্লাহ তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও'। কিছুদিন পরে উতায়বা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে 'যারক্বা' (الزرقاء) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠল, هو والله يأكلنى كما دعا محمد علىَّ 'আল্লাহর কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে দো'আ করেছিল'। পরদিন সকালে বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল।[16] এভাবে আবু লাহাব, তার স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল ও তাদের পুত্র উতায়বার নির্যাতনের প্রতিকার মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই কার্যকর হ'ল।

২.৪.২. আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি:

ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল আবু জাহল। তার মূল নাম আমর ইবনে হিশাম। জাহেলী যুগে তার উপাধি ছিল আবুল হাকাম। অর্থাৎ জ্ঞানের পিতা। তার আচরণের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাম রাখেন আবু জাহল অর্থাৎ মূর্খের পিতা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কুরায়েশ সরদারদের নিকটে একদিন আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারায় ধূলো লাগিয়ে রাখে কি? কুরায়েশদের সরদাররা বলল, হ্যাঁ। আবু জাহল বলল, লাত ও ওয্যার শপথ! আমি যদি তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে দেব, তাঁর চেহারা মাটিতে হেঁচড়াব। এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য সে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখল যে, আবু জাহল চিৎপটাং হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করছে এবং চিৎকার করে বলছে বাঁচাও বাঁচাও। তার পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখলাম, আমার ও মুহাম্মাদের মধ্যখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাসূল (ছাঃ) এ কথা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিড়ে ফেলত'।[17]

একবার আবু জাহল বলল, হে কুরায়েশ ভাইয়েরা! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা ও উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না? আমাদের পিতা ও পিতামহকে সারাক্ষণ গালমন্দ করেই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি একটি ভারী পাথর নিয়ে বসে থাকব, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে, তখন সে পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হ'লে তোমরা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবে, ইচ্ছে হ'লে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এরপর আবদে মানাফ আমার সাথে

যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করবে এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কুরায়েশরা প্রস্তাব শুনার পর বলল, কোন্ ব্যাপারে আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি? তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তুমি যা করতে চাও করতে পার। সকালে আবু জাহল একটি ভারী পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। কুরায়েশরা একে একে সমবেত হয়ে আবু জাহলের তৎপরতা দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। রাসূল (ছাঃ) যথারীতি হাযির হয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন আবু জাহল পাথর নিয়ে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু পরক্ষণে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলো। তার হাত যেন পাথরের সাথে আটকে রইল। কুরায়েশদের কয়েকজন লোক তার কাছে এসে বলল, আবুল হাকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি যে কথা রাতে বলেছিলাম, তা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পৌঁছাতেই দেখতে পেলাম, মুহাম্মাদ এবং আমার মাঝখানে একটা উট এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম! অত বড় লম্বা ঘাঁড় ও দাঁতবিশিষ্ট উট আমি কখনো দেখিনি। উটটি আমাকে হামলা করতে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, উটের ছদ্মবেশে ছিলেন জিবরীল (আঃ)। আবু জাহল যদি কাছে আসত, তবে তাকে পাকড়াও করা হ'ত।[18]

আবু জাহল একদিন ছাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালমন্দ করে ও শাসিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) নীরব রইলেন, কোন কথা বললেন না। এরপর আবু জাহল নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করল। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হ'ল। এরপর আবু জাহল কা'বার সামনে কুরায়েশদের মজলিসে গিয়ে বসল। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। ইতিমধ্যে হামযাহ শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাকে ঘটনা শুনালেন। হামযাহ ঘটনা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন কুরায়েশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আবু জাহলকে যেখানে পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কা'বা ঘরে আবু জাহলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী! তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছিস,

অথচ আমিও তাঁর প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী?[19] এ কথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায় বড় ধরনের জখম হয়ে গেল। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জাহলের গোত্র বনু মাখযূম এবং হামযাহ (রাঃ)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জাহল সকলকে এই বলে থামিয়ে দিল যে, আবু আমরকে কিছু বল না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছিলাম।[20]

ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মুসলমান হন। ফলে তাঁদের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। আবু জাহলের নির্দেশে বনু মাখযূমের এই ক্রীতদাস মুসলিম পরিবারের উপরে নৃশংসতম শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে ফেলে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের এই শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صبرًا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। ইয়াসিরের দুই পায়ে দু'টি রশি বেঁধে দু'দিকে দু'টি উটের পায়ে উক্ত রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে দিয়ে উট দু'টিকে দু'দিকে জোরে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জোরে হেঁচকা টানে ইয়াসিরের দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি শাহাদতবরণ করেন।[21]

অতঃপর পাষাণ হৃদয় আবু জাহল নিজ হাতে ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। অতঃপর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মারের উপরে শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতনের পালা। তাকে উত্তপ্ত কংকরময় বালুর উপরে হাত, পা বেঁধে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রেখে নির্যাতন করা হয়। একদিন আম্মারকে পানিতে চুবিয়ে আধামরা অবস্থায় উঠিয়ে বলা হ'ল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদকে গালি না দিবে এবং লাত, মানাত ও উযযা দেব-দেবীর প্রশংসা না

করবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন।

পরেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে কান্না-জড়িত কণ্ঠে সব ঘটনা খুলে বললেন ও আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ- 'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার জন্য কোন চিন্তা নেই)' (নাহল ১৬/১০৬)। পরে আবুবকর (রাঃ) আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :

جزى الله خيرا عن بلال وصحبه + عتيقا وأخزى فاكها وابا جهل

'আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রাঃ)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ ও আবু জাহলকে'।[22]

রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করার পরিণাম বদর প্রান্তরে এমন ভয়াবহ হবে আবু জাহল তা ভাবতে পারেনি। দুর্বৃত্ত নেতার চারিদিকে ছিল তীর ও তলোয়ার বাহিনীর পাহারা। মুসলিম মুজাহিদের প্রচন্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন যে, আবু জাহল একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী। তার মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি মুসলমানদের কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন আনছার

কিশোর। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ একজন চুপিসারে বলল, চাচাজান আবু জাহল কে? আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নবী করীম (ছাঃ)-কে গালি দিয়ে কষ্ট দেয়। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকে ততক্ষণ আমি তার সাথে লড়াই করে যাব। বর্নণাকারী (আব্দুর রহমান বিন আওফ) একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অন্য আনছার কিশোরও চুপিসারে একই কথা বলল। কয়েক মহূর্ত পরে আমি আবু জাহলকে লোকদের মাঝে বিচরণ করতে দেখলাম। আমি আনছার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখো তোমাদের শিকার। এ কথা শুনামাত্র উভয়ে আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল।

এরপর তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হ’ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছ? উভয়ে বলল, আমি হত্যা করেছি। তিনি (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। নবী করীম (ছাঃ) তাদের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই হত্যা করেছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মু‘আয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে প্রদান করলেন। তাদের একজনের নাম ছিল মু‘আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ ও অপরজনের নাম মু‘আবিবয ইবনে আফরা। [23]

এরপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, চলো আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে আবু জাহলের লাশের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফেরাঊন।[24]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু জাহল, ওতবা ইবনে রাবী‘আ, শায়বা ইবনে রাবী‘আ, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং উকবা ইবনে আবু মুঈত্বসহ অন্যান্য কাফেরের নাম ধরে ধরে বদদো‘আ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন,

একদিন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহর পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতেমার কানে পৌঁছল। তিনি দৌঁড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে কষ্টকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন,

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ.

‘হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশকে ধরো (তিনবার)! হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলকে ধরো। হে আল্লাহ! তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী‘আহ, ওয়ালীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্কবা বিন আবী মু‘ঈত্ব এবং ওমারাহ বিন অলীদকে ধরো’। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি’।[25]

২.৪.৩. খালাফের পুত্রদ্বয়ের কটূক্তি ও নিপীড়ন:

উমাইয়া ও উবাই ছিল খালাফের পুত্র। তারা নানাভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্ট দিত। উমাইয়ার অভ্যাস ছিল যে, যখন রাসূল (ছাঃ)-কে দেখত, তখনই কটূক্তি করত, তাঁকে অভিশাপ দিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ‘দুর্ভোগ প্রত্যক ঐ ব্যক্তির, যে সামনে ও পিছনে লোকের নিন্দা করে’ (হুমাযাহ ১০৪/১)। ইবনে হিশাম

বলেন, হুমাযা সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালাগালি করে এবং পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়।[26]

উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন বেলাল (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত। এরকম করার ফলে তাঁর গলায় দড়ির দাগ পড়ে যেত। উমাইয়া নিজে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করত। এরপর উত্তপ্ত বালুর উপর জোর করে শুইয়ে রাখত। এ সময়ে তাঁকে অনাহারে রাখা হ’ত। এমনকি কখনো কখনো তাঁকে দুপুরের তীব্র রোদে মরু বালুকার উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাঁপা দিয়ে রাখত।[27]

একবার সা‘দ ইবনে মু‘আয (রাঃ) মক্কায় উমাইয়া ইবনে খালাফকে বলেছিলেন, হে উমাইয়া! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এ ভয় তার সব সময় ছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনও মক্কার বাইরে যাবে না। আবু জাহলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী উট ক্রয় করে। যাতে করে বিপদের সময় খুব দ্রুত পালিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বলছিল, আবু ছাফয়ান! আপনার ইয়াছরেবী ভাই যে কথা বলেছিলেন, আপনি কি সে কথা ভুলে গেছেন? সে বলল, না ভুলিনি, আমি তো ওদের সাথে কিছুদূর যাব।[28]

মক্কায় জাহেলী যুগ থেকেই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধের দিনে উমাইয়া তার সন্তান আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে উমাইয়া

বলল, আমি কি তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারি? তোমার বর্মগুলোর চেয়ে আমরা উত্তম। আজকের মত দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই?[29] এ কথা শুনে আব্দুর রহমান বর্মগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার পুত্রকে বন্দী করে সামনের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বেলাল (রাঃ) উমাইয়াকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, ওহে কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ! হয় আমি বেঁচে থাকব নতুবা তুমি বেঁচে থাকবে। এরপর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ওহে আনছাররা! এই দেখো কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ, এবার হয় আমি থাকব নতুবা সে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, ততক্ষণে লোকেরা আমাদেরকে ঘিরে ফেললেন। আমি তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একজন ছাহাবী তলোয়ার তুলে উমাইয়ার পুত্র আলীর পায়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সে ঢলে পড়ল। এদিকে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে যে, আমি এত বিকট শব্দ কখনও শুনিনি। আমি বললাম, পালাও পালাও। কিন্তু আজতো পালানোর পথ নেই। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারব না। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, উত্তেজিত ছাহাবাগণ উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে ঘিরে ফেলে আঘাতে আঘাতে হত্যা করে ফেলল।[30]

উবাই ইবনে খালাফ উমাইয়ার ভাই। উকবা ইবনে আবু মুঈত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। উকবা উবাইয়ের কথা মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। উবাই বিন খালাফ নিজে একবার মরা-পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যাতে তাঁর মুখ ভর্তি হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হয়।[31] সে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ

করত এবং হত্যার হুমকিও দিত। নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় থাকাকালে দেখা হ'লে সে গর্বভরে বলত, 'হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে 'আওদ' নামের একটি ঘোড়া রয়েছে; ওকে আমি প্রতিদিন তিন ছা' (সাড়ে সাত কিলোগ্রাম) খাবার খাওয়াচ্ছি। সেই ঘোড়ার পিঠে বসে একদিন আপনাকে হত্যা করব। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলতেন, উল্টাও হ'তে পারে। ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।[32]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদের যুদ্ধে ময়দানে পৌঁছার পর উবাই ইবনে খালাফ একথা বলে সামনে অগ্রসর হ'ল যে, মুহাম্মাদ কোথায়? হয়ত আমি থাকব নতুবা তিনি থাকবেন। ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ওকে আসতে দাও। এই দুর্বৃত্ত কাছে এলে রাসূল (ছাঃ) হারেছ ইবনে সাম্মার (রাঃ) নিকট থেকে ছোট একটি বর্শা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা ছিল ঠিক তেমনি, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দেয়, এতে মাছি উড়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) এরপর উবাইয়ের মুখোমুখি হ'লেন, ইবনে খালাফের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝামাঝি একটুখানি জায়গা (গলার কাছে) খালি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) সেই স্থান লক্ষ্য করে হাতের বর্শা নিক্ষেপ করলেন।

এতে উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল এবং তার মিত্রদের কাছে ফিরে গেল। তার গলার কাছে সামান্য কেটে গিয়েছিল বটে, কিন্তু রক্ত বের হয়নি। আঘাতও তেমন ছিল না। তবুও সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছেন। লোকেরা তাকে বলল, কি বাজে বকছ? তোমার আঘাত তো তেমন গুরুতর নয়। গলায় সামান্য আঁচড় লাগার মত দেখা যাচ্ছে। উবাই বলল, তিনি মক্কায় আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই আল্লাহর শপথ! আমার প্রাণ চলে যাবে।

সে গাভীর মত চিৎকার করে বলত, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছি, সেই কষ্ট-যন্ত্রণা যদি যিল-মাযাযের অধিবাসীরা অনুভব করত, তাহ'লে তারা সবাই মারা যেত।[34] অন্যত্র আছে, সে বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ মক্কায় বলছিলেন, আমিই তোমাকে হত্যা করব। তিনি যদি আমাকে থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবুও আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত।

অবশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে মারা যায়।

২.৫. মহানবী সা.-কে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল তায়েফবাসী

মহানবী সা. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরুর পর তার ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে কুরাইশরা। কুরাইশদের নির্যাতনের সময় ঢাল হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন চাচা আবু তালিব ও নবীজির সহধর্মীনী হজরত খাদিজা রা.।

তারা মহানবী সা.-কে মানসিকভাবে অভয় ও আশ্বাস বাণী দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সবসময়। তাদের ইন্তেকালের পর কুরাইশদের নির্যাতন বেড়ে যায়। এসময় রাসূল সা. মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ গমন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আজাদকৃত গোলাম ও পালকপুত্র জায়িদ ইবনে হারিসা রা.।

আশা করেছিলেন তায়েফের লোকেরা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তার এমন প্রত্যাশার দুটি কারণ ছিল— তায়েফের অদূরে বনি সাকিফ গোত্রে মহানবী সা. দুধ পান করেন এবং তায়েফ সর্দারদের একজন কোরাইশ গোত্রে বিয়ে করেছিল।

দুধের আত্মীয় ও গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে মহানবী সা. তাদের থেকে সদাচার প্রত্যাশা করেছিলেন।

তায়েফে ১০ দিন তিনি গোপনে, প্রকাশ্যে, একাকী ও সামগ্রিকভাবে দাওয়াত দেন। তিনি বাজারে দাঁড়িয়ে কোরআন তিলাওয়াত করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস)

কিন্তু তায়েফবাসী তাকে হতাশ করে এবং তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করে মহানবী সা.-এর ওপর।

প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় নবীজি যেভাবে কেঁদেছিলেন

মহানবী সা.-এর বাবার ইন্তেকাল হয়েছে যেভাবে

মহানবী সা.-কে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন মদিনাবাসী

রাসূল সা. তায়েফের নেত্রীস্থানীয়দের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা মানতে অস্বীকার করলো এবং তায়েফের সাধারণ মানুষদের মহানবী সা.-এর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল। (সিরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ১০৮)

তারা মহানবী সা.-কে তায়েফ ত্যাগের নির্দেশ দিল। মহানবী সা. সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় উচ্ছৃঙ্খল বালকদের তার পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা নবীজি সা.-এর দিকে পাথর নিক্ষেপ করে গালাগাল করতে শুরু করল।

তাদের পাথরের আঘাত ও অত্যাচারে মহানবী সা.-এর পুরো শরীরের রক্তাক্ত হয়ে যায়। রক্তে তার জুতা ভরে যায়।

এ সময় জায়িদ রা. অসামান্য আত্মত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মহানবী সা.-এর জন্য ঢাল হয়ে যান। যে দিক থেকে পাথর ছোড়া হচ্ছিল তিনি সেদিক থেকে তাঁকে আগলে রাখছিলেন। ফলে তার মাথার কয়েক জায়গায় কেটে যায়।

তাদের এই অত্যাচারে রাসূলুলুল্লাহ সা. মাটিতে বসে পড়তেন। তখন হতভাগারা তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে দিত এবং সামনে চলতে বলত। আর সামনে পা বাড়ালেই পাথর নিক্ষেপ করত। (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ১৪৩; মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস : ১/৩৬২)

তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত মক্কার উতবা, রাবিয়া ও শায়বাদের বাগানে আশ্রয় নেওয়া পর্যন্ত দুর্বৃত্তরা মহানবী সা.-এর পিছু নিয়েছিল। এখানে আশ্রয় নেওয়ার পর তিনি একটি দোয়া করেন। যা 'দোয়ায়ে মুস্তাদয়িফিন' (অসহায় মানুষের দোয়া) নামে পরিচিত।

তিনি তার দোয়ায় বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই ফরিয়াদ জানাই আমার দুর্বলতার, আমার নিঃস্বতার এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার। আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু। অসহায় ও দুর্বলদের প্রতিপালক তো আপনিই! আমার প্রতিপালকও আপনি। আপনি কার হাতে আমাকে সোপর্দ করেছেন। অনাত্মীয় রুক্ষ চেহারাওয়ালাদের কাছে অথবা এমন শত্রুর কাছে আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন, যারা আমার ও আমার কাজের ওপর প্রবল। আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন তবে এর পরও আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তবে আপনার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আফিয়াত আমার জন্য অধিক প্রশস্ত। হে আল্লাহ, আমি আপনার সত্তার নূরের আশ্রয় প্রার্থী, যা দিয়ে সমগ্র আঁধার আলোকিত হয়ে যায় এবং দ্বিন ও দুনিয়ার সব কিছু পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আপনি আমার ওপর কি অভিশাপ অবতীর্ণ করবেন বা ক্রোধান্বিত

হবেন যে অবস্থায় আমি আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। সব শক্তি ও ক্ষমতা শুধু আপনারই। আপনার শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।'

এ সময় আল্লাহ তায়েফের পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠান। তারা মহানবী সা.-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত তায়েফের অধিবাসীদের পাহাড়ে পিষে ফেলার অনুমতি চাইল। কিন্তু মহানবী সা. তা দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। (নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ১৫৪)

২.৬. কুরআন তেলাওয়াত শুনতে বাধা প্রদান

উপর্যুক্ত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুশরিকরা মানুষদেরকে তাদের সাধ্যমত কুরআন ও ইসলামের দাওয়াতের কথা শ্রবণ করতে বাধা প্রদান করতো। তারা যখন দেখতো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দীনের পথে আহবান করছে বা নামাজ আদায় করছে, কুরআন তেলাওয়াত করছে তখন তারা মানুষদেরকে সেখান হতে তাড়িয়ে দিত, হৈচৈ-হৈ-হুল্লোড়, দাঙ্গা- হাঙ্গামা, হট্টগোল পাকিয়ে দিত, গান গাইতো এবং নানা খেল-তামাশায় মেতে উঠত। এ বিষয়ে কুরআনের বাণী-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ

কাফিররা বলে- এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার। ১৯১৪

অবস্থা এমন করে ফেলতো যে, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আর লোকদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শোনাতে পারতেন না। এ অবস্থা নবুওতী পঞ্চম

বর্ষের শেষ অবধি চলে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে তাঁর তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে মুশরিকরা এরকম হট্টগোল বাধাত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে নযর ইবনে হারিসের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে ছিলো কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম শয়তান। নযর ইবনে হারিস একদা হিরাহ চলে গেলো। সেখানে রাজ-রাজাদের ঘটনাবলী, ইরানের বিখ্যাত বীর রুস্তম ও প্রাচীন গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডারের কাহিনী শিখলো। এসব শেখার পর সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনাক্রমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জায়গায় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতো, আল্লাহ তায়ালার শপথ হে কুরাইশরা! আমার কথা মুহাম্মাদের কথার চেয়ে উত্তম। তারপর সে পারস্য রাজাদের, রুস্তম এবং সেকান্দার রাজার (আলেকজান্ডার) কাহিনী শোনাতে শুরু করতো এবং বলতো, বল- কোনদিক দিয়ে মুহাম্মাদ এর কথা আমার কথার চেয়ে উত্তম। ১৯০ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে এটাও জানা যায় যে, ইসলাম বৈরিতার চরম পর্যায়ের ব্যবস্থা হিসেবে নযর একাধিক ক্রীতদাসী রেখেছিলো। যখন সে জানতে পারত যে, কোনো লোক ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করছে, তখন সেই লোকের প্রতি এক ক্রীতদাসীকে নিয়োজিত করে দিতো। ক্রীতদাসীকে বলতো তুমি তাকে খাওয়া দাওয়া করাও এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য গীত গাও, বাদ্য বাজাও। মুহাম্মাদ যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছে এটা তার চেয়ে উত্তম। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলা

হয়েছে- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

কিছু মানুষ আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহ তায়ালার পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

১৯৫. ইবনে হিশাম: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৯, ৩০০, ৩৫৮

১৯৬. সূরা লুকমান: আয়াত-৬, আদ দুররুল মানসুর: খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৭

৩. ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬৩২–৭৫০)

মুহাম্মাদের প্রথম উত্তরাধিকারী, যাদের খলিফা বলা হয় - আবু বকর, উমর, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবু তালিব তাঁরা আল-খুলাফা আল-রাশিদুন ("খুলাফায়ে রাশেদীন") হিসাবে পরিচিত। মুহাম্মাদ(সাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলী ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর ছিলেন মুহাম্মাদ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ওমর ছিলেন আবু বকর এর পরবর্তী খলিফা। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উসমান ছিলেন তৃতীয় খলিফা। তিনি একজন ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। আলী ছিলেন মুহাম্মাদ এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাই। তিনি চতুর্থ এবং শেষ খলিফা ছিলেন। আলী এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হাসান খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু হাসান কিছুদিন পরই মুয়াবিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মুয়াবিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম উমাইয়া খলিফা ছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক বিজয় এবং ধর্মীয় বিভাজনের একটি সময়। এই যুগের ঘটনাগুলো ইসলামের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের শেষে, ইসলাম একটি শক্তিশালী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে। খিলাফত উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে যা এই অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ইসলামী সংস্কৃতি, আইন এবং শিক্ষার বিকাশকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

৩.১.১. হজরত নুহের (আ.) মহাপ্লাবনের ঘটনা

হজরত আদমের (আ.) ইন্তেকালের পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। শয়তানের ধোঁকায় মানুষ ধীরে ধীরে মূর্তিপূজা করতে শুরু করেছে। এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে একজন নবী পাঠান—যিনি এক আল্লাহর দাওয়াত দেন, শিরক না করার নসিহত করেন। তার নাম হজরত নুহ (আ.)।

কুরআনে তার নামে একটি সুরা আছে এবং ২৮টি সুরায় ৮১টি আয়াতে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত নুহ (আ.) সাড়ে নয়শো বছর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়কালে অক্লান্তভাবে তিনি কেবল দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। কী সকাল, কী বিকাল; কী দিন, কী রাত; প্রকাশ্যে কিংবা চুপিসারে—তিনি শুধু এ কথাই বলে গেছেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। তবু কি তোমরা সাবধান হবে না?' (সুরা মুমিনুন, আয়াত ২৩)

কিন্তু কেউ তার দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। বরং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কানে আঙ্গুল দিয়ে কিংবা নিজেকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে সটকে পড়েছে, তার প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছে। এটাই ছিল নিত্যদিনের গল্প। এরপরেও ধৈর্য ধরে তিনি শুধু দাওয়াত দিয়ে গেছেন। সব অবহেলা সয়ে নিয়ে শুধু আল্লাহর কথা বলেছেন।

হজরত নুহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন বর্তমান সময়ের ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চলে। এর আগে মানুষ কেবল কৃষিকাজ করত, সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু ওই সময় সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে শুরু করে এবং

সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—এক ভাগে ছিল অভিজাত শ্রেণি, অন্য ভাগে ছিল নিম্নশ্রেণি।

অভিজাত শ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করত, তাদের নিচু চোখে দেখত। অভিজাতরা দেখতেই কেবল মানুষ ছিল, তাদের মাঝে মানুষের কোনো গুণ ছিল না। তাদের আচার-আচরণ ছিল জন্তু-জানোয়ারের মতো। (তাবিলুল আহাদিস, শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি, পৃষ্ঠা ১৮)

তারা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামে পাঁচটি মূর্তির পূজা করত। হজরত নুহ (আ.) কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলে তাদের নেতৃবৃন্দ বলত, তোমরা মূর্তিদের ত্যাগ করো না।

তবু নুহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশিত কাজ করে যেতেন—মানুষকে এক আল্লাহর এবাদত করতে বলতেন। কোনোদিন দাওয়াতি কাজ ছেড়ে দেননি, কখনো নিরাশ হননি।

তার অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ বলল, ‘হে নুহ, তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব।’ (সুরা শুআরা, আয়াত ২৬৬) এরপরেও নুহ (আ) থেমে যাননি, তিনি উলটো দোয়া করেন, ‘হে খোদা, তুমি তাদের ক্ষমা করো, তারা বোঝে না।’

কিন্তু দিনের পর দিন শুধু অত্যাচারের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। অভিজাত লোকেরা তাদের সন্তানদেরও শিখিয়ে দিত কীভাবে নবী ও মুসলিমদের প্রতি জুলুম করতে হবে।

নুহ (আ.) আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক, তারা তো আমাকে অমান্য করছে, আর অনুসরণ করছে এমন ব্যক্তির—যার সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দুর্দশা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবে না।’ (সুরা নুহ, আয়াত ২১)

এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা ওহি মারফত জানালেন, ‘তোমার কওমের যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।’ (সুরা হুদ, আয়াত ৩৬)

হজরত নুহ (আ.) তখন কাতরকণ্ঠে ফরিয়াদ করলেন, ‘হে খোদা, আমাকে সাহায্য করুন। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত ২৬)

তিনি আরও বলেন, ‘আপনি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন, আমাকে ও মুমিনদের (তাদের হাত থেকে) রেহাই দিন।’ (সুরা শুআরা, আয়াত ১৮৮)

একদম শেষে তিনি বদদোয়া করেন, ‘হে আমার রব! পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের একজনকেও আপনি ছাড় দিবেন না। আপনি যদি তাদেরকে রেহাই দেন, তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গুমরাহ করবে আর কেবল পাপাচারী কাফির জন্ম দিতে থাকবে।’ (সুরা নুহ, আয়াত ২৬-২৭)

এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে একটি বিশাল নৌকা তৈরি করতে বলেন। কীভাবে নৌকা বানাতে হবে আল্লাহ তাআলাই শিখিয়ে দেন।
হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘নৌকাটি লম্বায় ছিল ১২০০ হাত, আর পাশ ছিল ৬০০ হাত।’ উচ্চতা ছিল ৩০ হাত, তিনতলা ছিল—নিচতলায় কীট-পতঙ্গ ও জন্তু-জানোয়ার, দোতলায় মানুষ আর তেতলায় থাকবে পাখ-পাখালি। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৮, ইফা)

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন আমার নির্দেশ আসবে আর চুলা (পানিতে) উথলে উঠবে, তখন প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনদের নৌকায় তুলে নেবে, তবে তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে (ডুবে মরার) পূর্বসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর জালিমদের পক্ষে আমার নিকট আবেদন করো না, তারা (বন্যায়) ডুবে মরবেই।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত ২৭)

যেহেতু ওই অঞ্চলে কখনোই বন্যা হয়নি, বছরের বেশির ভাগ সময় খরা থাকত, তাই কাফেরেরা নৌকা নিয়ে হাসি-মজাক করত। তারা ঠাট্টা করে বলত, নুহ এতদিন ছিলে নবী, নবুওয়তি ছেড়ে এখন হয়েছ কাঠমিস্ত্রি! অবশেষে নির্দিষ্ট দিন আসে।

হজরত নুহ (আ.) নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ৮০ জন মুমিন এবং পশু-পাখি নিয়ে নৌকায় চড়ে বসেন। তারা নৌকায় ওঠার পরেই আকাশ ভেঙ্গে তুফান শুরু হয়, মাটির নিচ থেকেও পানি উঠতে শুরু করে। দুই দিকের পানি মিলে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়েরও ১৫ হাত উপরে পানি উঠে যায়।

দুনিয়ায় থাকা এমন একজন কাফেরও ছিল না যে আল্লাহর এই আজাব থেকে বাঁচতে পেরেছে। বিশাল এই নৌকাটি ১৫০ দিন ভেসে বেড়ায়, তারপর মুহাররমের ১০ তারিখে জুদি পাহাড়ে নোঙর ফেলে।

৩.১.২ যেভাবে খোদাদ্রোহী নমরুদের পতন হয়

নমরুদ ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ে পৃথিবীর বাদশাহ ছিল। সে ছিল পৃথিবীর চারজন বড় বড় শাসকের অন্যতম। নমরুদ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছে। পবিত্র কোরআনে তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সে-ই সর্বপ্রথম রাজমুকুট পরিধান করেছে এবং নিজেকে খোদা দাবি করেছে।

ইতিহাসবিদ ইবনে আসিরের বর্ণনা মতে, নমরুদের বংশপরম্পরা এমন : নমরুদ বিন কিনআন বিন কুশ বিন হাম বিন নূহ (আ.)।

নমরুদ শব্দটির উৎপত্তি মূলত ‘নমর ও উদ’ বা ‘নমরা ও উদু’ শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ হচ্ছে জাজ্বল্যমান আলো। কারো কারো মতে, আবার এ নামের অর্থ বিদ্রোহী, অর্থাৎ খোদার বিরুদ্ধে দ্রোহিতার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হতো।

এর আরো একটি অর্থ হলো বাঘিনী। আরবের কিংবদন্তি অনুযায়ী নমরুদকে বাল্যকালে এক বাঘিনী স্তন্য পান করিয়েছিল। ইতিহাসবিদরা নমরুদকে আল-জব্বার বা চরম স্বেচ্ছাচারী হিসেবে বিবেচনা করে। যার স্বেচ্ছাচারিতা তার শক্তি, ক্ষমতা ও দম্ভের প্রকাশভঙ্গি ছিল।

বাইবেল অনুসারে নমরুদ ছিল ‘এক মহাশক্তিধর ব্যক্তি, যে ঈশ্বরকে শিকার করতে চেয়েছিল।’

রাজাদের রাজা নমরুদ

নূহ (আ.)-এর মৃত্যুর পরের বছর মিসরে ৪২টি রাজ্যের রাজ্যপতিদের একটি সম্মেলন হয়, যেখানে নমরুদ রাজার রাজা (কিং অব কিংস) উপাধিতে ভূষিত হয়। এই খ্যাতি ও সম্মানের শিখরে পৌঁছে তার মানসিকতার পরিবর্তন আসে এবং নিজেকে দেবতা বলে দাবি করে এবং তার প্রার্থনা করার আদেশ দেয়, আর তখন থেকেই প্রজারা তাকে উপাস্যরূপে তার পূজা ও অর্চনা শুরু করে।

হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ

হজরত ইবরাহিম (আ.) ১০ বছর সবার আড়ালে এক গুহায় বসবাস করতেন। হয়তো নির্জনে বসবাস করার জন্য বাল্যকাল থেকেই হজরত ইবরাহিম (আ.) প্রকৃতি এবং স্রষ্টাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

অবশেষে তিনি আসল স্রষ্টাকে চিনতে পারেন। আর তাই তাঁর গোত্রের লোকদেরকে দেব-দেবীর অসারত্ব দেখিয়ে দিতে সেসব মূর্তি ভেঙে দেন এবং বলেন যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তারা তোমাদের কিভাবে রক্ষা করবে।
এর ফলে হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে বন্দি করা হয় এবং নমরুদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'হে ইবরাহিম, তোমার রব কে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'যিনি এক, যাঁর কোনো শরিক নেই, যিনি আরশের অধিপতি।'

নমরুদ রেগে গিয়ে তার লোকদের বলল, 'ওকে পুড়িয়ে ফেলো; সাহায্য করো তোমার দেবতাদের, যদি একান্তই তাদের জন্য কিছু করতে চাও।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৬৮)

নমরুদ বলল, 'একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো; আর হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও। আর পাহারা দাও যেন তাঁর কোনো সাহায্যকারী তাঁকে সাহায্য করতে না আসে।'

লোকেরা এক জায়গায় লাকড়ি জোগাড় করে সেগুলোতে তেল ও ঘি ঢেলে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সাত দিন পর পূর্ণ অগ্নিকুণ্ড তৈরি হলো, কিন্তু সমস্যা হলো হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য কেউ আগুনের ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারছিল না। এ সময় ইবলিস পর্যটকের বেশে সেখানে পৌঁছে চড়কগাছ তৈরির পরামর্শ দিল। তার পরামর্শে একটা চড়কগাছ তৈরি করা হয়। এবং তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

মহান আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দেন—'হে অগ্নি, তুমি হজরত ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৬৯)

হজরত ইবরাহিম (আ.) ৪০ দিন পর্যন্ত অগ্নিকুণ্ডে ছিলেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

আল্লাহকে হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস

মহান আল্লাহকে হত্যার উদ্দেশ্যে নমরুদ ও তার সেনাপতি প্রস্তুত হয়ে সিন্দুকে আরোহণ করে ঊর্ধ্বপানে উড়ে চলল। ঊর্ধ্ব আকাশে যখন পৌঁছাল, অর্থাৎ যেখান থেকে আকাশ বা পৃথিবীর কিছুই আর দেখা যায় না। এরপর নমরুদ তীর নিক্ষেপ করার প্রস্তুত নিল। তারপর একের পর এক তারা তীর ওপরের দিকে নিক্ষেপ করল। সে সময় মহান আল্লাহ হজরত জিবরাইল (আ.)-কে বলেন, 'আমার এই বান্দা যেন নিরাশ না হয়।'

মহান আল্লাহর কথা শুনে হজরত জিবরাইল (আ.) তীরের মাথায় রক্ত লাগিয়ে তা ফেরত পাঠাল, যাতে নমরুদ বুঝতে পারে যে সে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর খোদাকে 'হত্যা' করতে পেরেছে। তীর নিক্ষেপ শেষ হলে নমরুদ পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে।

মাটিতে অবতরণ করার পর নমরুদের রক্ষীরা নিক্ষিপ্ত তীরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এলো। যেগুলো পাওয়া গেল তার সবই ছিল রক্তরঞ্জিত। নমরুদ রক্তমাখা তীরগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই আমরা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর খোদা এবং স্বর্গের বাসিন্দাদের হত্যা করতে সমর্থ হয়েছি এবং তার সাক্ষ্য বহন করে তীরে লেগে থাকা রক্তই।'

৩.১.৩ নমরুদের ভয়ংকর মৃত্যু

নমরুদ আল্লাহর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিল। হজরত ইবরাহিম (আ.) দূরে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। দূরে কালো রঙের একটা মেঘ দেখা যাচ্ছিল, যখন সেটা কাছে চলে এলো, লাখ লাখ মশার গুনগুন শব্দে ময়দান মুখরিত হলো। কিন্তু নমরুদ অবজ্ঞার সুরে বলল, এ তো মশা! তুচ্ছ প্রাণী, তা-ও আবার নিরস্ত্র। এ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক সৈন্যের মাথার ওপর মশা অবস্থান নিল। অতঃপর তাদের বুঝে ওঠার আগেই মশাগুলো তাদের নাক দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করল। তারপর দংশন করা শুরু করল। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তীরন্দাজরা ঊর্ধ্বে তীর নিক্ষেপ আর পদাতিক সেনারা নিজেদের চারপাশে অন্ধের মতো তরবারি চালাল, যার ফলে একে অপরকে নিজেদের অজান্তেই আহত বা নিহত করে ফেলল।

মশার সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে নমরুদ পালিয়ে প্রাসাদে চলে এলো। এ সময় একটি দুর্বল লেংড়া মশা তাকে তাড়া করল এবং কিছুক্ষণ মাথার চারপাশে ঘুরে নাসিকাপথে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ল। এরপর মগজে দংশন করা শুরু করল। নমরুদ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উন্মাদের মতো প্রাসাদে প্রবেশ করল এবং যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে পাদুকা খুলে নিজের মাথায় আঘাত করতে শুরু করল। অবশেষে মাথায় মৃদু আঘাত করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী নিযুক্ত করল নমরুদ।

সুদীর্ঘ ৪০ বছর তাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে মাথার আঘাতের ব্যথায় নমরুদের মৃত্যু হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা. ৬৮৬)

নমরুদকে নিয়ে আরবি ভাষায় একটি বই রয়েছে। সেখানে তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। বইটির নাম 'আল-মালিকুন নামরুদ : আওয়ালু জাবাবারাতিল আরদ্বি অর্থাৎ বাদশাহ নমরুদ, যিনি পৃথিবীর প্রথম স্বৈরশাসক।

৩.২ হাবিল-কাবিল থেকে শিক্ষা

হজরত আদম এবং হাওয়া (আ.) –এর অনেক সন্তান ছিল। তাদের দুই ছেলে ছিল— কাবিল ও হাবিল। কাবিল ছিল বড়। মা-বাবার কথা মেনে চলত না। হাবিল ছিল ছোট। মা-বাবাকে মেনে চলত।

আদম ও হাওয়া (আ.) –এর আকলিমা নামে একটি মেয়ে ছিল। কাবিল তাকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু আদম ও হাওয়া (আ.) চাইলেন আকলিমাকে ছোট ছেলে হাবিলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। কাবিল তা মেনে নিতে পারেনি। এভাবে কাবিল নিজের মা-বাবা এবং ভাইয়ের শত্রু হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বেঁধে গেল বিবাদ। তখন সৃষ্ট এ বিবাদ নিরসনে আল্লাহ হুকুম দিলেন, ‘তোমরা কোরবানি করে পাহাড়ের ওপর রেখে এসো। যার কোরবানি কবুল হবে, তার সঙ্গে আকলিমার বিয়ে হবে।’

হজরত আদম এবং হাওয়া (আ.) –এর অনেক সন্তান ছিল। তাদের দুই ছেলে ছিল— কাবিল ও হাবিল। কাবিল ছিল বড়। মা-বাবার কথা মেনে চলত না। হাবিল ছিল ছোট। মা-বাবাকে মেনে চলত।

আদম ও হাওয়া (আ.) –এর আকলিমা নামে একটি মেয়ে ছিল। কাবিল তাকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু আদম ও হাওয়া (আ.) চাইলেন আকলিমাকে ছোট ছেলে হাবিলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। কাবিল তা মেনে নিতে পারেনি। এভাবে কাবিল নিজের মা-বাবা এবং ভাইয়ের শত্রু হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বেঁধে গেল বিবাদ। তখন সৃষ্ট এ বিবাদ নিরসনে আল্লাহ হুকুম দিলেন, ‘তোমরা কোরবানি করে পাহাড়ের ওপর রেখে এসো। যার কোরবানি কবুল হবে, তার সঙ্গে আকলিমার বিয়ে হবে।’

এটি দেখে বড় ভাই কাবিল খুব রেগে গেল। সে হাবিলকে বলল, ‘আমি তোমাকে হত্যা করব।’ হাবিল বলল, ‘আল্লাহ সৎ বান্দার কোরবানি কবুল করেন। এখন তুমি যদি

আমার সঙ্গে লড়াই করো, তবে আমি তোমার গায়ে হাত তুলব না।' অবশেষে এর জেরে একদিন বড় ভাই কাবিল ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করল। এটা ছিল পৃথিবীর প্রথম মানুষ হত্যা। হাবিলকে হত্যার পর কাবিল চিন্তায় পড়ে গেল যে তার লাশ এখন কী করবে, কীভাবে তা লুকিয়ে রাখবে!

তখন কাবিল দেখতে পেল, একটি কাক ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে অন্য একটি কাককে দাফন করছে। এটা দেখে কাবিলও তার ভাই হাবিলের লাশ মাটির নিচে দাফন করল।

এ ঘটনা জানতে পেরে হজরত আদম ও হাওয়া (আ.) খুব কষ্ট পেলেন। এবং মানবহত্যার মতো পাপ এর শুরু হলো।

৪. ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭৫০-১২৫৮)

আব্বাসীয়রা ছিলেন মুহাম্মাদ এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। তারা উমাইয়াদের আরব-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ৭৫০ সালে আব্বাসীয়রা কুফায় একটি বিপ্লব ঘোষণা করে। এই বিপ্লবে উমাইয়া খলিফা মালিক ইবনে আনাসের পরাজিত হয় এবং আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের কাছ থেকে ইবেরীয় উপদ্বীপ ব্যতীত সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইবেরীয় উপদ্বীপের অংশ তখন উমাইয়াদের অধীনে একটি স্বাধীন খিলাফত হিসেবে পরিচিত ছিল, যাকে আন্দালুসীয় খিলাফত বলা হয়। আব্বাসীয়দের ৭৫০ সালে উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসার ফলে মুসলিম বিশ্বে নতুন এক যুগের সূচনা হয়, যা আব্বাসীয় যুগ নামে পরিচিত। আব্বাসীয় খিলাফত ৭৫০ সাল থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫০৮ বছর স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তবে ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণের ফলে আব্বাসীয় খিলাফত ভেঙে পড়ে। আব্বাসীয় যুগে আব্বাসীয়রা মুসলিম

বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগ ছিল ইসলামের জন্য এক স্বর্ণযুগ।আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার পর খিলাফতের রাজধানী পরিবর্তন করা হয়। দামেস্ক থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হয় বাগদাদে।

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়, ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদে বাইতুল হিকমত নামে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রটি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্ডিতদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন করেছিলেন। এই সময়টিকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় কারণ এই সময়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা বিষয়ে মুসলিমরা ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। আল-কিন্দি, আল ফারাবী, আল খারেজমি, ইবনে সিনা, হাসান ইবনুল হায়সাম, আল বিরুনি, ইবনে রুশদ, আল-জাজারি, আল-গাজ্জালি, ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, উলুঘ বেগ এবং আরও অনেক বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত এই সময়ে অবদান রেখেছিলেন। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উন্নয়ন করেছিলেন। তাদের কাজ মধ্যযুগীয় ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

৪.১ ফেরাউনের শেষ পরিণতি ও আমাদের শিক্ষা

‘ফেরাউন ও তার বাহিনী জমিনে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ, বাদশাহ ফেরাউন। খোদা দাবিদার। অন্যায়ের বাদশাহ। আল্লাহর নবী হজরত মূসা (আ.) এর প্রতিপক্ষ। তার অন্যায়, জুলুম খোদায়ী দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন নবী মূসা (আ.)।

এক আল্লাহ ও সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিতে ফেরাউনের রাজ্যে দাওয়াত নিয়ে গেলেন। কিন্তু ফেরাউন অহংকারী হয়ে উঠলো। নিজের ক্ষমতা ও আধিপত্যের মোহে সে অন্ধ। ফলে আল্লাহর নবীকে মারতে যেয়ে নিজেই আল্লাহর ক্রোধে ধ্বংস হয়েছিলো।

কোরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মধ্যে হজরত মুসা (আ.) এর যুগে জালেম অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর নাফরমানিতে সে এতই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, এক পর্যায়ে নিজেকে বড় রব 'আনা রাব্বুকুমুল-আলা' বলেও দাবি করেছিল। হজরত মুসা (আ.) এর তবলীগ প্রচারকে বারবার অমান্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালাও তাদের পরীক্ষার জন্য নানা আসমানি বালা নাজিল করতে থাকেন এবং সংশোধিত হওয়ার জন্য বারে বারে সময়ও দিতে থাকেন।

ফেরাউনের কিবতি জাতি যখন কোনো বিপদ আপদের শিকার হত, হজরত মুসা (আ.) এর নিকট এসে দোয়া প্রার্থনা করত, যাতে তার দোয়ায় বালা-বিপদ কেটে যায়। মুসা (আ.) এর দোয়ায় তারা বিপদমুক্ত হয়ে ফের আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু একই সময় এই বিপদ হতে মুসা (আ.) এর বনি ইসরাইল মুক্ত থাকত, তাদের কোনো ক্ষতি হত না। এ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে কোরআনে বলা হয়েছে, 'অতঃপর, আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক এবং রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। (সূরা আরাফ, আয়াত-১৩৩)। এর পূর্বের আয়াতে বলা হয়, 'এবং নিশ্চয় আমি ফেরাউন বংশকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-শস্য হানির দ্বারা ধৃত করেছিলাম, যেন তারা হৃদয়ঙ্গম করে।' (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৩০)। মিসরের বাদশাহ ফেরাউন যখন হজরত মুসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেই সময়ে আল্লাহর আদেশক্রমে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপদ তাদের চতুর্দিক হতে গ্রাস করে ফেলে। প্রথমেই ফেরাউনের অবাধ্যতার পরিণতিস্বরূপ দীর্ঘদিনব্যাপী আজন্মা শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষে মিসরবাসী আক্রান্ত হয় এবং সমগ্র দেশ ক্ষুধার্তের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন যে,

আল্লাহদ্রোহী ফেরাউন ও পথভ্রষ্ট মিসরবাসীর সত্য ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্যই আমি তাদের ওপর সর্বপ্রথম এই শাস্তি প্রেরণ করেছিলাম।

এই দুইটি আয়াতে হজরত মুসা (আ.) এর প্রার্থনা অনুসারে ফেরাউন ও মিসরবাসীর ওপর যেসব ভয়াবহ শাস্তি (আজাব) অবতীর্ণ হয়েছিল তা-সহ ফেরাউনের হঠকারিতার সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ফেরাউনের অবাধ্যতার জন্য প্রথমে অজন্মা, শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষে মিসর দেশ জর্জরিত হতে থাকে। কিন্তু ফেরাউন স্বীয় প্রজাসাধারণের করুণ ক্রন্দনে নিরুপায় ও বিষণ্ন হয়ে হজরত মুসা (আ.) নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার প্রার্থনা অনুসারে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়ে যায়। অনন্তর ফেরাউন পুনরায় বিদ্রোহ ও অত্যাচার আরম্ভ করায় হজরত মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে স্বীয় লাঠির দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত করলেন। যার দ্বারা সমগ্র মিসরে জলাশয় ও জলধারাসমূহ জলাশয় ও জলধারাসমূহ তরল শোণিত স্রোতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যাবতীয় মৎস্য ও জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে এক অসহ্য দুর্গন্ধে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবুও তারা ফিরে আসেনি। দিন যায় রাত আসে। ফেরাউনের ঔদ্ধত্য বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মূসা নবী ও তার দলবলকে হত্যা করতে ধাওয়া করে। পথিমধ্যে মিশরের নীল নদ দিয়ে মূসা নবী ও বনী ঈসারাঈল অলৌকিভাবে পার হয়ে যায়। ডুবে মারা যায় ফেরাউন। বিশ্ববাসীর জন্য আজও ফেরাউনের লাশ দৃষ্টান্তস্বরূপ সংরক্ষিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনুল কারিমে এসব ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

‘আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফসলাদির ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা সতর্ক হয়।’ (আরাফ ৭ : ১৩০)।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

'ফেরাউন জমিনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদের সে যবাই করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।' (কাসাস ২৮ : ৪)।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

'ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ (ফিরাউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে পারে? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে।' (আরাফ ৭ : ১২৭)।

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

'ফেরাউন বলল, কী! আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এটা কোনো চক্রান্ত। তোমরা এই শহরে পারস্পরিক যোগসাজশে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে পার। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত

দিক থেকে কেটে ফেলব তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।' (আরাফ ৭ : ১২৩-১২৪)।

৪.২. ক্ষমতার দাপটে ঔদ্ধত্যে বিভোর ফিরাউন:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى

'সে বলল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। পরিণামে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে রয়েছে শিক্ষা।' (নাযিয়াত ৭৯: ২৪-২৬)।

৪.৩. ঈমানদারের উপদেশ ও সতর্কবাণী:

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا...

'ফেরাউনের বংশের এক মুমিন ব্যক্তি, যে এ পর্যন্ত তার ঈমান গোপন রেখেছিল, বলে উঠল, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ কোনো সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়াত দান করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ তো রাজত্ব তোমাদের, জমিনে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের ওপর যদি আল্লাহর

আজাব এসে পড়ে, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর বিপরীতে আমাদেরকে সাহায্য করবে?...।' (মু'মিন ৪০ : ২৮-২৯)।

৪.৪. ঔদ্ধত্যের কারণে ফিরাউন ও কওমের পরিণতি:

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

'ফেরাউন ও তার বাহিনী জমিনে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ, জালিমদের পরিণতি কী হয়ে থাকে! (সূরা : কাসাস ২৮ : ৩৯-৪০)।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

'আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফিরাউন ও তার বাহিনী যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে মরার সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাইল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনোও ইলাহ নেই এবং আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (উত্তর দেয়া হলো) এখন ঈমান আনছ? অথচ এর আগে তো তুমি অবাধ্যতা করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সুতরাং আজ আমি তোমার

দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। (কেননা) আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে।' (ইউনুস ১০ : ৯০-৯২)।

৫. প্রাক-আধুনিক যুগ (১২৫৮-১৮'শ শতক)

মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার সুবাধে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। সুফি তরিকার দরবেশরাও বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং মানুষকে ইসলামের শিক্ষায় দীক্ষা দিতেন। এইভাবে, ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২৯৭]

সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে উসমানীয় সাম্রাজ্য, সাফাভি সাম্রাজ্য এবং মুঘল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যগুলোর কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর ধর্ম ছিল ইসলাম। এই ধর্ম সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার ধর্মীয় অনুশীলনকে প্রভাবিত করেছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসকগণ সুফিবাদে বিশ্বাস করতেন। সুফিবাদ হলো ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক শাখা যা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর জোর দেয়। উসমানীয় শাসকগণ সুফিবাদের প্রচার করেছিলেন এবং সুফি দরগাহগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই কারণে, সুফিবাদ উসমানীয় সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মৌলভি তরিকা এবং বেকতাশি তরিকা হলো সুফিবাদের দুটি প্রধান শাখা। এই তরিকাগুলোর সুফিদের উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতানদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৩১২] এই সম্পর্ক উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং সুফিবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক ছিল।[৩১৩] সাফাভি সাম্রাজ্য ছিল একটি শিয়া ইসলামী সাম্রাজ্য। সাফাভি শাসকগণ দ্বাদশ ইমামবাদী শিয়া ইসলামকে প্রচার করেছিলেন। এই কারণে, দ্বাদশ ইমামবাদী শিয়া ইসলাম ইরান এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইরানি অভিবাসীরা দক্ষিণ এশিয়ায় শিয়া ইসলামের বিস্তারে সহায়তা করেছে। এই অভিবাসীরা দক্ষ আমলা এবং জমিদার হিসাবে কাজ করত। তারা শিয়া ইসলামের শিক্ষা এবং অনুশীলনকে দক্ষিণ এশিয়ায়

ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।[৩১৪] নাদির শাহ ছিলেন একজন শিয়া মুসলিম যিনি সাফাভি সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সুন্নিদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি বারো ইমামবাদকে সুন্নি ইসলামের পঞ্চম মতবাদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন, যাকে জাফারিবাদ বলা হয়।কিন্তু, এই প্রস্তাবটি উসমানীয় সাম্রাজ্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৫.১ হযরত শাহজালাল (রঃ):

গোবিন্দের পলায়নঃ

আত্মসমর্পণ এবং ক্ষমা ভিক্ষার পর শাহ- জালাল গৌড় গোবিন্দকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়া মুক্তি দিলেন। মানব দুশমন শয়তান তার অনুসারী কাফির দোজখীদের উদ্দেশ্য করে। দোজখে বসে অগ্নিমঞ্চে আরোহণ পূর্বে ভাষণে অনুসারীদের বলবেন,

- আজ আমার করার কিছুই নেই, আমার ও তোমাদের আজ একই

দশা, কাউর কল্যাণ কেহ করতে পারবে না। তাই আমার ভরসা

তোমরা ছেড়ে দাও, নিজেদের ভবিষ্যতের দুঃখ-দুর্দশার জন্য প্রস্তুত হও।

মানব শয়তান গোবিন্দেরও অজ ঐ একই দশা। গৌবিন্দও ধরা পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা অন্তর অবশ্য মুক্তি পেলো-অধিকার যদিও পেলো না, রাজ্য হারাও হল-মুক্তিতে তার পালানোর সুযোগ হল। কিন্তু, তার অন্যায় কার্যে সহযোগী যারা ছিল, তাদের আজ কি দশা। তারা মুক্তি পেলো কোথায়? তারাও তো এক একজন আলাদা আলাদা দোষী।

তাদের এ দোষ সমেত মুসলমান শাসনের যাতাকলে ফেলে গোবিন্দ পগার পার হয়ে যাবে মনে মনে স্থির করে শয়তানী চাল খাটায়ে হযরত শাহজালালকে বলিলঃ

মহাত্মন! আমি একা মুসলমান হইলে কী হবে? আগামীকাল সপরিবার, স্বজন-সহজন সহ এসে সম্মিলিত ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিব। মনে মনে শয়তানের বক্তৃতা স্মরণ করে-হে আমার অপকর্মে সহযোগী মহোদয়গণ, তোমাদের মুক্তি দেয়ার কোনই উপায় আমার নেই, ভাগ্যিস আমি মুক্তি পেয়েছি। আর তোমাদের মুক্তির ব্যাপারে আমার দায়িত্বই বা কি? তোমরা আমার কথায় অপকর্ম যা করেছিলে, তাতে তোমরাই তো দোষে লিপ্ত-দোষী হলে আমি হতে পারি হুকুমের দোষী, কিন্তু তোমরা তো সেজন্য আর কর্ম সম্পাদনের দোষের অপরাধ হতে এড়াতে পার না। তাই, প্রত্যেকে আপন আপন কল্যাণের পথ আবিষ্কার কর।

সে যাই হউক সাক্ষাৎ যমদূতের হাত হতে রেহাই পাইয়া গোবিন্দ সরাসরি নি জর গোপন আস্তানায় ফিরে গেল। মনে মনে কিন্তু সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে নেই। সে যেমন মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, মুসলমানদের অনুরূপ ভাবতে লাগলো । অত্যাচার ও ব্যাভিচারের খতিয়ান খুঁজিয়া দেখলো, যে জঘন্য অপরাধ সে এতদিন করে আসছে হযরত শাহজালাল হতে মুক্তি পাওয়ার পরেও সে সব লোক তাকে কোন দিন রেহাই দিবে না। কিন্তু সে জানেনা, মুসলমানদের ব্যক্তিগত আক্রোষ তিন দিনের অধিক থাকে না, এটা তাঁদের ধর্মীয় বিধান। বিধর্মী তা জানবে কোথা হতে সে দীক্ষা তো সে গ্রহণ করতে আদৌ সুযোগ পায় নেই । ইসলাম ধর্ম আলিংগন করলে যে তার পূর্ণকৃত যাবতীয় পাপ মোচন ছাড়াও অন্যান্য মুসল- মানরা তার ভ্রাতৃতুল্য হয়ে যাবে, তা তার জানার কথা মহে। মূলকথা হল, সে যে শাহজালালের কাছে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল, সেটা ছিল তার একান্তই ভ্রান্ত-মুসলমান হওয়ার সামান্য কল্পনাটুকুও তার অন্তরে স্থান পায়নি । তাই নিজেকে নিরাপদ না ভাবা স্বাভাবিক।

আর দেরী করে লাভ নাই রাজা গৌড় গোবিন্দ সপথের ভিখারী হয়ে প্রতিশ্রুত পর দিনের আগের রাতেই তার পরিবার-পরিজনসহ সম্ভাব্য বহনোপযোগী সোনাদানা নিয়ে আসামের দিকে পালায় গেল। অতঃপর তাঁর খোঁজ-খবর আর কেউ পায়নি। হয়তো কিছু দিন বাঁচিয়া ছিল-নয়তো পথেই লোভী দস্যু-তস্করের হাতে মারা গিয়েছিলেন।

৬. আধুনিক যুগ (১৮শ-২০শতক)

উসমানীয় রাজবংশের ইসলামের শেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় আবদুল মজিদ।

১৮০০ সাল থেকে মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে অমুসলিম ইউরোপীয় শক্তির সাথে তুলনা করলে, সাধারণভাবে রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে ছিল। এর আগে, ১৫ শতকে, রিকনকোয়েস্টা ইবেরিয়ায় মুসলিম উপস্থিতির অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। রিকনকোয়েস্টা হলো একটি শতাব্দীব্যাপী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খ্রিস্টানরা ইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে মুসলিমদের বহিষ্কার করেছিল। ১৯ শতকে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণ করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্য ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতে শাসন করেছিল।পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায়, অনেক বুদ্ধিজীবী ইসলামকে সংস্কার করার চেষ্টা করেন।ইসলামি আধুনিকতা, যা প্রাথমিকভাবে পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা সালাফিবাদ নামে অভিহিত করা হয়েছিল, আধুনিক মূল্যবোধ এবং নীতি যেমন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিল। ইসলামী আধুনিকতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ আবদুহ এবং জামাল উদ্দিন আফগানি। মুহাম্মদ আবদুহ ছিলেন একজন মিশরীয় ধর্মীয় নেতা এবং লেখক যিনি ইসলামকে আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন। জামাল উদ্দিন আফগানি ছিলেন একজন আফগান ধর্মীয় নেতা এবং রাজনৈতিক কর্মী যিনি ইসলামী বিশ্বের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করেছিলেন।আবুল আ'লা মওদুদী

আধুনিক রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করেছিলেন। আবুল আ'লা মওদুদী ছিলেন একজন পাকিস্তানি ইসলামী পণ্ডিত যিনি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন।আধুনিক ন্যায়সংহিতার অনুরূপে, শরিয়াহর সাথে প্রথমবারের মতো ১৮৬৯ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মেজেলে নীতি আংশিকভাবে আইনে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে পরাজিত হয়। এরপর, ১৯১৮ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ভেঙে ভাগ করে দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালে, তুরস্কের নতুন সরকার খিলাফতকে বিলুপ্ত করে দেয়। সর্ব-ইসলামবাদীরা মুসলিমদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল এবং সর্ব-আরববাদীদের মতো ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। ১৯৬৯ সালে, জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে দুজন ইহুদি ধর্মীয় নেতা দ্বারা আগুন দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, ১৯৬৯ সালে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে কাজ করে।

৭. সমসাময়িক যুগ (২০শতক-বর্তমান)

রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নির্যাতনকে যখন ওএইচসিআর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন গণহত্যা, জাতিগত নির্মূল এবং অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে শনাক্ত করে তখন জাতিসংঘ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই গণহত্যাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে।

ইন্টারনেট, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মতো আধুনিক প্রযুক্তির উত্থানের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখন ধর্মীয় জ্ঞানকে আরও সহজে জানতে পারে। এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনের মধ্যে নতুন নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বেড়েছে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেমন, হিজাব পরা, যা একসময় মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন বিশ্বের অন্যান্য অংশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও এটি সাধারণ হয়ে উঠছে।[৩৫৯] এছাড়াও, কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী পবিত্র গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইসলামী বিশ্বাসকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আলাদা করার চেষ্টা করছেন। এর ফলে ইসলামের একটি আরও "নির্ভুল" এবং "আধুনিক" ব্যাখ্যার বিকাশ হতে পারে।আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয় নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এর ফলে স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী উলামাদের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে এবং নতুন ধর্মীয় নেতাদের উত্থান হতে পারে।কিছু মুসলমান ইসলামের একটি আরও "ব্যক্তিগতকৃত" ব্যাখ্যা গ্রহণ করছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনকে নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাগুলোকে অনেকে "অসামঞ্জস্যপূর্ণ" বলে সমালোচনা করেন, কারণ তারা ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যা থেকে সরে যায়।অনেক মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি বিদেশী আদর্শ হিসাবে দেখেন যা বৈদেশিক

উপনিবেশকালীন শাসকদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৭.১ ইসরায়েল গোটা দুনিয়ার দুশমন

ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের বর্বর হামলা প্রমাণ করেছে ইসরায়েল শুধু ফিলিস্তিনের দুশমন না, গোটা দুনিয়ার দুশমন। ইসরায়েল মানবতার দুশমন। পুরো দুনিয়া অস্থিতিশীল করছে। ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

আর কত রক্ত ঝড়ালে এটাকে গনহত্যা বলা যাবে?(পরিসংখ্যানে গত ৫ মাসে ১ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হয়েছে, প্রতিদিন ২০ জন শিশু শহিদ হচ্ছে, ৭.৫ মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদেরকে তাদেরকে মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে)

শেষ কথা, অত্যাচারীর অত্যাচার এক সময় না এক সময় শেষ হবেই।

৭.২ ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয়ঃ

ইয়াজুজ মাজুজ এরা নবী নূহ(আঃ) বংশোদ্ভুত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পুর্বাঞ্চলে অবশিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভয় দেশ সমুহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধবংসের থাবা বিস্তার করতো। বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আ:) এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গন ও একথাই মনে করেন

রাশিয়া ও উওর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরুপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাডা একথাও জানা যায় তাদের আক্রমন থেকে আত্নরক্ষার জন্ন ককেম্পসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মান করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিষ্ণ সাগরের উওর ও পুর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উওরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

৭.২.১ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কিত তথ্য:

কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে “ইয়াজুজ-মাজুজ”-এর উত্থান অন্যতম। ইয়াজূজ মাজূজ সম্প্রদায় আদম (আঃ)-এর বংশধর। তারা ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর সময় পৃথিবীতে উত্থিত হবে। শাসক যুলক্বারনাইন তাদেরকে এখন প্রাচীর দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন (সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭)। -ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে তারা সেদিন বেরিয়ে আসবে এবং সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের প্রথম দলটি নদীর পানি খেয়ে শেষ করে ফেলবে এবং শেষদলটি এসে বলবে ‘হয়ত এখানে কোন একসময় নদী ছিল’ । তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না। -এক সময় তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের এক পাহাড়ে গিয়ে বলবে,”দুনিয়াতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন আকাশে যারা আছে তাদের হত্যা করব।” তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন। -এসময় ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো‘আ করবেন। এতে স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তারা সবাই মারা যাবে ও পঁচে দুর্গন্ধ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের লাশ থাকবে । আল্লাহ শকুন পাঠাবেন। লাশগুলোকে তারা নাহবাল নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। মুসলিমরা তাদের তীর ও ধনুকগুলো ৭ বছর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫) ।

ইয়াজূজ এবং মাজূজের উদ্ভব/আকারঃ - ইয়াজূজ এবং মাজূজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি হাদিসে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অনির্ভরযোগ্য কথাও প্রসিদ্ধ যে তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। -বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টটা থেকে মানুষকে বাঁচাতে যুলকারনাইন তাদের প্রবেশ পথ বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। -নবী করীম (সা:) বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ্‌র আদেশে ঈসা (আ:) মুমিনদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

৭.২.২ ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ:

-যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন- আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আনি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর

ইয়াজূজ ও মাজূজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেগ করতেও সক্ষম হল না (সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭)

৭.২.৩ যে ভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে:

-যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে আদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। -আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম (সা:) বলেন- অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন কার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনই তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব! পরদিন আল্লাহ্ পাক সেই প্রাচীরকে পূর্বের থেকেও শক্ত ও মজবুত রূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সেই সময় আসবে এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ্ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূরে দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে [তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম]

৭.৩ দাজ্জাল:

- দাজ্জাল মানুষ। তবে, আল্লাহ্ তাকে স্পেশাল কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেবেন।

- তার বাবা মা ইহুদী হবে। তার বাবা হবে দীর্ঘকায়, যার নাক লম্বা। তার মাও হবে বিশালদেহি।

- ৩০ বছর তারা নিঃসন্তান থাকবে। এরপর তাঁদের বাচ্চা হবে। কিন্তু, তার বাম চোখ অন্ধ। সেই দাজ্জাল।

- তার প্রকাশ হবে এক লোকের সাথে ঝগড়া করার মাধ্যমে। -তার প্রকাশের সময়কাল এমনঃ তখন বিশাল যুদ্ধ চলবে। (হয়ত ৩য় বিশ্বযুদ্ধ, তবে ধর্মযুদ্ধ) মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টান শহর জয় করছে। তার আগমন হবে ইস্পাহানে মতান্তরে খোরাসানে ইরাক-ইরানের মাঝামাঝি থেকে। সমস্ত ইসরাইল হবে তার অনুগত। আর্মড। আরও অনেকে তার পক্ষে যোগ দিবে।

- প্রথম সে হবে তাঁদের নেতা, এরপর বলবে সে নবী। এরপর বলবে সে আল্লাহ।

- সে সব অঞ্চল, দেশ একে একে জয় করবে। একমাত্র মক্কা আর মদিনা বাদে। এ ২ টি শহর এর পেরিমিটার পাহারা দেবে আল্লাহ্‌র ফেরেস্তারা। তবে, মদিনার বাহিরে সে আসার পর মদিনায় ভুমিকম্প হবে। ফলে, অনেকে ভয়ে বের হয়ে যাবে, আর দাজ্জাল তাঁদের কব্জা করবে।

- সে কী অলৌকিক জিনিস দেখাবে? সে যেখানে যাবে, বিরান মরুভুমি হলেও বৃষ্টি হবে, শস্যতে ভরে উঠবে। যেন মানুষ তাকে মানে।

- তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সে এলাকা হবে বিরান, আসবে দুর্ভিক্ষ।

- সে তার কাছে থাকা কোন একটা কিছু দিয়ে বেহেশত আর দোজখ এর "ইমেজ" দেখাবে।

- তার কপালে কাফ, ফা, রা লিখা থাকবে... (কাফির)

- সে মৃতকে জীবিত করতে পারবে না। তবে, মানুষের মনে হবে সে তা করছে। কেন? কারণ, সে যখন কাউকে বলবে আমি যদি তোমার বাবা মা কে জীবিত করে দেখাই, তবে কি তুমি বিশ্বাস করবে, আমি ঈশ্বর? পরে সে তাই করবে। তবে, তার বাবা মা সত্যি আসবে না, যারা আসবে তারা হল শয়তানের সহচররা যারা রূপ ধরবে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হবে।

- সে কাউকে মারতে চাইলে মারবে, এরপর সে আবার তাকে জীবিত করতে চাবে। আল্লাহ্‌ আবার জীবিত করে দিবেন। এরপর জিজ্ঞেস করবে, এবার আমাকে মান? যদি

বলে হ্যাঁ, তবে সে চির জাহান্নাম পাবে, যদি বলে না, তবে দাজ্জাল তাকে তার শো করা জাহান্নাম এর দিকে তাকে ফেলে দিবে। আর এরপর সে নিজেকে আবিষ্কার করবে, জান্নাতে। তার বিচার হবে না।

- দাজ্জাল অনেক কম সময়ে সারা দুনিয়া 'ঘুরবে'।

- দাজ্জাল এর প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর নেতা ইমাম মাহদি। তাকে সাহায্য করতে একদিন ফযরের আজান এর সময় দামেস্কের যে মসজিদ এ সুলতান সালাহউদ্দিন সমাহিত, সে মসজিদের মিনারে ফেরেস্তারা ঈসা (আ) কে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। (এ জায়গাটাই ধারণা করা হয়) -ঈসা (আ) এসেছেন শুনেই দাজ্জাল বাহিনীর মনবল ভেঙ্গে যাবে। দাজ্জাল একটা নির্দিষ্ট দিকে পালাবে। ঈসা (আ) তাকে তাড়া করবেন, তার হাতে থাকবে 'তরবারি'; লুদ নামের জায়গায় দাজ্জালকে হত্যা করবেন ঈসা (আ)।

৭.৩.১ দাজ্জালের আগমনের আভাসঃ

১/ মুসলিম হয়েও নিয়মিত নামায আদায় করবে না।

২/ মানুষ সহজেই মিথ্যা বলবে।

৩/ দুনিয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

৪/ মানুষ সহজেই সুদ নিবে/দিবে।

৫/ ঘুষ হবে খুবই স্বাভাবিক।

৬/ শাসক সম্প্রদায় হবে দুর্নীতিপরায়ণ।

৭/ বিশ্বব্যাপী ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে।

৮/ নারীরা স্বল্প বসন পড়তে লজ্জিত হবে না।

৯/ বৃদ্ধদের উপর শ্রদ্ধা কমবে।

১০/ অনেকেই শয়তানের পুজা করবে।

১১/ অনেক বড় দুর্ভিক্ষ হবে পৃথিবীতে।

১২/ বেড়ে যাবে incest.

১৩/ গালিলি সাগরের (Galilee Sea) পানি শুকিয়ে যাবে।

১৪/ একই রমযান মাসে একটি সূর্য আর একটি চন্দ্র গ্রহণ হবে।

৭.৩.২ দাজ্জালের শেষ পরিণতিঃ

সহীহ হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে।

- মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মুমিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ)কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ “তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।" ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইহুদী লকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।

- সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (স) বলেন- "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলমানগণ ইহুদীরকে হত্যা করবে। ইহুদীরা গাছ ও পাথরের আড়ালে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিবেনা। গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত মুমিন।

৮. দুশমনদের পরিনতি থেকে আমাদের শিক্ষা

কোরআন থেকে শিক্ষা

আয়াতের অর্থ : 'তোমার আগেও অনেক রাসুলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরি করেছে তাদের আমি কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! ...তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠিন। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই। আল্লাহভীরুদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা এ রকম : তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলগুলো ও ছায়া চিরস্থায়ী।

যারা আল্লাহভীরু এটা তাদের কর্মফল এবং অবিশ্বাসীদের কর্মফল আগুন।' (সুরা : রা'দ, আয়াত : ৩২-৩৫)
আয়াতগুলোতে ধর্মীয় কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা ও বিধান

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে

বিদ্রুপকারীদের অবকাশ দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের অধিক যোগ্য করে নেন।

২. যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে তারাও স্বীকার করে গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তাদের উপাস্যরা আল্লাহর সমকক্ষ নয়, অথচ শরিক হওয়ার জন্য সমকক্ষ হওয়া আবশ্যক।

৩. কোরআনে জান্নাতের উপমা দেওয়া হয়েছে মানুষকে বোঝাতে। পৃথিবীর কোনো কিছুই জান্নাতের সমতুল্য নয়। (তাফসিরে তাবারি : ৪/৪২৭)

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমর বিন লুহাইয়ের প্রতি অভিশাপ। কেননা সে আরব সমাজে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটিয়েছে।

৫. ধর্মীয় অনাচারগুলো সাধারণত নেক সুরতে শুরু হয়ে থাকে। (আত তাহরির ওয়াত তানভির : ১৩/১৫৩)

৯. মুসলিমের সবচেয়ে বড় দুশমন:

আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন?

শয়তানকে বলা হয় মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, যার কারণে আদি মানব-মানবীসহ বহু আদম সন্তানের পদস্খলন ঘটেছে। বনী ইস্রাঈলের বিখ্যাত আবেদ বারসিসার কথা কে না জানে?

যাকে শয়তান প্রথমত এক মেয়ের সাথে কথা বলতে প্ররোচিত করেছিল। তারপর তাকে দিয়ে যিনা, খুন, শিরকসহ সব ধরনের জঘন্য অপকর্ম করিয়েছে (ইবন কাসির, ১৩/৪৯৭। তাবারী, ২৮/৪৯-৬০]শুধু বারসিসা নয়, এ পৃথিবীর বহু মানুষকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই সংশয়ী মনে প্রশ্ন আসতেই পারে- শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হলো?

?

কেন আল্লাহ তায়ালা এমন একজনকে সৃষ্টি করলেন, যার দ্বারা তাঁর বান্দারা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে?

শয়তান)شيطان(শব্দটি কোনো ব্যক্তিবাচক শব্দ নয়, বরং একটি সিফত বা গুণবাচক বিশেষ্য; যা মূলত ইবরানী বা গ্রীক "শাতানুন" শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে।শাতানুন অর্থ হলো: অভিযুক্ত, দোষারোপকৃত বা বিরোধী। অর্থাৎ যার বিরোদ্ধে অভিযোগ করা হয়, কোনো বিষয়ে যাকে দোষারোপ করা হয় অথবা যে কোনো পক্ষের বিরোধিতা করে, তাকে "শয়তান" বলা হয়। তবে কোনো কোনো ভাষাবিদের মতে "শাতানুন" শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো: দূরে অবস্থিত হওয়া।
যেমন: আরবীভাষীগণ বলেন: শাতানাতিদ দারু (Iشطنت ال(অর্থাৎ বাড়িটি দূরে অবস্থিত। এ হিসেবে শয়তান অর্থ হলো : যে দূরে সরে গেছে।
ইসলামের পরিভাষায় বিদ্রোহী বা অবাধ্য আত্মাকে শয়তান বলা হয়। এবং খৃষ্টধর্মে একে বলা হয় "লুসিফার"। [Why Satan was named Iblees (Islam web)O https://goo.gl/FVpVh4]
অর্থাৎ শয়তান কোনো শরীর বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। বরং মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দানকারী অসৎ প্রবৃত্তিকে শয়তান বলা হয়।এ ধরনের মানসিকতা বা প্রবৃত্তি যেহেতু ভালো ও সৎ কাজের বিরোধীতা করে, সৎ কর্ম থেকে দূরে থাকে, তাই ধরনের প্রবৃত্তিকে শয়তান বলা হয়।এবং সকলেই এ ধরনের প্রবৃত্তিকে দোষারোপ করে এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ সকল কুপ্রবৃত্তির বিষয়ে সতর্ক করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً .. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين

শয়তান দুই প্রকার। ক. শরীর বিশিষ্ট শয়তান যেমন- মানুষ
খ.অদৃশ্য বিশিষ্ট শয়তান যেমন জিন।

আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে বলেন "আমি মানুষ এবং জ্বীনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরের চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা কুমন্ত্রণা দেয়" (সূরা আনআম আয়াত -৬:১১২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম একবার আবু যর আল গাফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলেন "হে আবু যর! তুমি মানুষ শয়তান ও জ্বীন শয়তানের ক্ষতি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর। " (মুসনাত আহমাদ - ২১০৩৬)

সাইফুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন "মানুষ এবং জীনের মধ্যে বিদ্রোহী এবং অবাধ্যরাই হচ্ছে শয়তান। "
অতএব প্রমাণিত হলো যে শয়তান হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। মানুষ কিংবা জিন জাতির মধ্যে যারা আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং যারা সৎ কর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারাই হলো শয়তান।

শয়তান এবং ইবলিশের মধ্যে পার্থক্য:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শয়তান হলো একটি গুণগত বা বৈশিষ্ট্যগত নাম এবং শয়তান দুই প্রকার-

১. মানুষ শয়তান এবং

২.জিন শয়তান

পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীমে "ইবলিশ" শব্দের একাধিক ব্যবহার যেমন রয়েছে তেমনি এর একাধিক অর্থও রয়েছে।
ক. শব্দটি (আল-ইবলাসু) শব্দ থেকে গঠিত। যার অর্থ হল বিচ্ছিন্ন হওয়া লজ্জিত হওয়া হতাশ হওয়া নিরাশ হওয়া ইত্যাদি। এ অর্থে,শব্দটি কোরআনুল কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে।যেমন- "যেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।"

(সূরা রুম ৩০: ১২) ।এই হিসাবে যেহেতু ইবলিশ শয়তান আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তাই তাকে ইবলিশ বলা হয়।

খ. কারো মতে ইবলিশ অর্থ হলো অহংকার বসত আদেশ ও নির্দেশ অমান্য করা। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম তখন ইবলিশ ব্যতীত সবাই সিজদা করলো।সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা - বাকারা,২: ৩৪)

গ.অভিধানকারক এবং কোন কোন মুফাসসিদের মতে ইবলিশ শব্দটি অনারবী শব্দ যা আরবি ভাষায় আত্তীকরণ করা হয় এবং আরবি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর মূল অর্থ হল "আল-কুওওয়াতুল ওয়াহমিয়্যা" অর্থাৎ এমন সংক্রামক শক্তি যা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন "মানুষ বা জ্বীন যার মধ্যেই অশুভ ও সংক্রামক শক্তির বীজ রয়েছে তাকে ইবলিশ বলা হয়।" (তাফসীরে ইবনে আরাবী, ১/২৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় ইবলিশ শব্দটিরও শয়তান শব্দের মত একাধিক অর্থ রয়েছে। তবে কোরানুল কারীমের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় জিন জাতির সরদার আযাযিল কে ইবলিশ বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন "যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম আদমকে সেজদা করো তখন ইবলিশ ব্যতীত সবাই সেজদা করলো। সে ছিল জ্বীনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করলো। (সূরা কাহাফ, ১৮: ৫০)

যেহেতু আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং সে আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তাই তাকে ইবলিশ বলা হয়।

কেন আল্লাহ তায়ালা কুপ্রবৃত্তি বা শয়তান সৃষ্টি করলেন?

প্রথমত, আমরা জানি "শয়তান" একটি গুণ বা বৈশিষ্টগত নাম। কেউই "শয়তান" হয়েই জন্মায় না বরং নিজকর্মের দ্বারা সে "শয়তান" হয়।
ইবলিশ এবং তার উত্তরসূরীদেরকে আল্লাহ জোর করে "শয়তান" বানাননি বরং তার নিজ কর্ম দ্বারা "শয়তান" হয়েছে জিন এবং মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে।তারা ভালো-মন্দ কর্ম বেছে নিতে পারে ইবলিশ এবং তার উত্তরসূরীরা নিজেরাই মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়া এবং শয়তান হওয়ার পথ বেছে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জগতের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছা এবং অনুমতি ক্রমে হয়ে থাকে। মানুষ এবং জিনকে জাতিকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। তাদের ভাল কর্মের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। যেহেতু মানুষের সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং ভালো কর্মের সাথে সাথে পাপকর্ম আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারী হয়ে থাকে। তবে কেবলমাত্র এই অর্থে যে, আল্লাহ পাপ বা খারাপ হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

এ অর্থে নয় যে, আল্লাহ তায়ালা পাপ কাজ করার অনুমোদন করেন বা পাপ কাজের আদেশ দেন পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ বা অপরাধ সংঘটিত হয় এগুলোর ওপর আল্লাহ তাআলার কোন সন্তুষ্টি নেই।আল্লাহ এগুলো ঘৃণা করেন,অপছন্দ করেন এবং এগুলো থেকে বিরত হবার আদেশ দেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ রহ. তারঁ "শিফাউল আলিল" গ্রন্থে শয়তান সৃষ্টির কিছু কারন উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন ইবলিশ এবং তার বাহিনীর পেছনে এত হিকমত রয়েছে যার বিস্তারিত আল্লাহ ছাড়া কেউই অনুধাবন করতে পারবে না। এর মধ্যে অল্প কিছু হেকমতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -

১.শয়তান এবং তার শিষ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদেরকে ইবাদতের উৎকর্ষের দিকে ধাবিত করে নবীগণ এবং আল্লাহ তাআলার বান্দারা শয়তান ও তার শিষ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইবাদতকে চূড়ান্ত উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছেন। আল্লাহর নিকট শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং শয়তান থেকে বাঁচার জন্য বারবার আল্লাহর নিকট ফিরে আসার মাধ্যমেই তারা তাদের ঈমানকে পাকাপোক্ত করেছেন। শয়তান না থাকলে তো ইবাদতের এই সুউচ্চ অবস্থান পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

২.শয়তানের জন্যই আল্লাহর বান্দারা তাদের পাপের জন্য ভীত হয়। কারণ তারা তো জানে পাপের কারণে ইবলিশের কি দশা হয়েছে। পাপের কারণে ইবলিশ ফেরেশতাদের সাহচর্য থেকে নেমে গেছে এবং বিতাড়িত হয়ে গেছে। এই ঘটনা থেকে একজন মুমিন শিক্ষা নেয়। ফলে তার তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতি বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয়।

৩. মানুষের আদি পিতা কে ভুল দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধানের বাইরে যায়, তারঁ ইবাদতের অহংকার ও অবাধ্যতা করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ইবলিশ কে একটি নিদর্শন বানিয়েছেন। আর যারা পাপ করলে অনুশোচনা করে এবং তার প্রভুর নিকট ফিরে যায় তাদের জন্য আল্লাহ আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে একটি নিদর্শন বানিয়েছেন।

৪.ইবলিশ শয়তান হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার একটি নিদর্শন। আল্লাহ যে বিপরীত ধর্মীর সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন,ইবলিশ তার একটি প্রমাণ।যেমন তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, পানি ও আগুন সৃষ্টি করেছেন, ঠান্ডা ও গরম সৃষ্টি করেছেন, ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন;তেমনি জিব্রাইল আলাই সালাম ও ফেরেশতাদের বিপরীতে ও শয়তানদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

৫.কোন কিছুর পূর্ণমোহত্ত বোঝা যায় তার বিপরীত ধর্মী কোন কিছুর মাধ্যমে। যদি কুৎসিত কোন কিছু না থাকতো তাহলে আমরা সৌন্দর্যের মহত্ব কখনোই বুঝতে পারতাম না। যদি দারিদ্র না থাকতো তাহলে আমরা সম্পদশালী হওয়াকে মূল্য দিতাম না।

৬. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নিকট তারঁ সংযম,ধৈর্য,সহনশীলতা, পরম দয়া ও ঔদার্য্য প্রকাশ ঘটাতে পছন্দ করেন। আর এজন্য এমনটি ঘটা প্রয়োজন যে,তিনি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা তার সাথে শরিক করবে এবং তাকে ক্ষুদ্ধ করবে এরপরও তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার নেয়ামত ভোগ করতে দেবেন। জীবিকা দেবেন, সুস্বাস্থ্য দেবেন এবং সকল প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করতে দেবেন। ইচ্ছা শুনবেন এবং তাদেরকে অনিষ্ট থেকে সরিয়ে নেবেন।

উপসংহার

দ্বিনি কাজে বাধা দান করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধ করে কেউ তাওবা না করলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা কাফির এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না।' (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৪)

দ্বিনের পথে বাধা দান জঘন্য অপরাধ।

এর জন্য আল্লাহ পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদাররা, পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে মানুষের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রেখেছে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।' (সুরা তাওবা, আয়াত: ৩৪)
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদের আজাবের পর আজাব বাড়িয়ে দেব।কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।' (সুরা নাহল, আয়াত: ৮৮)
অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের বাহানা কোরো না। তাহলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে তোমরা আমার পথে বাধা দান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।' (সুরা নাহল, আয়াত: ৯৪)

আল্লাহ আরো বলেন, 'যারা কুফরি করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সব

মানুষের জন্য সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

' (সুরা হজ, আয়াত: ২৫)
দ্বিনের পথে বাধা দানকারীরা যত কৌশল অবলম্বন করুক, তারা যতই প্রভাবশালী হোক, একসময় ব্যর্থ হতে হবে। পরাজয়ের মালা তাদের গলায় পরতেই হবে। এটা মহান আল্লাহর ঘোষণা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সব কর্ম ব্যর্থ করে দেন।' (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১)

পৃথিবীর পূর্ববর্তী উম্মতের মতো বর্তমানেও এমন অনেক লোক আছে, যারা ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় স্বার্থে কিংবা নিজেদের বশবর্তী হয়ে দ্বিনের কাজে বাধা দানের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিনের কাজে বাধা দানের জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উপরন্তু এ জন্য তাদের ব্যয়িত অর্থের জন্যও তারা আফসোস করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন, 'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে বাধা দান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তা-ই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' (সুরা আনফাল, আয়াত: ৩৬)
মহান আল্লাহ আমাদের সহিহ বুঝ দান করুন। আমিন।

Referance

১. আল-কুরআন

২. আর-রাহীকুল মাখতুম

৩. উইকিপিডিয়া

৪. প্রথম-আলো

৫. কালের কণ্ঠ